বিপ্লবী
রাসবিহারী বসু

বীর বিপ্লবী রাসবিহারী

রাসবিহারী বসু আমাদের জীবনের সম্মুখে প্রতিভাত হইবামাত্র আমাদের শ্রদ্ধা-প্রশংসা-সম্ভ্রম-আবেগ-উৎসাহ-উদ্দীপনা ঐরূপ ব'লে উঠল; আমাদের বাধা-বন্ধন যেন টুটল, আমাদের জীবন জীবন্ত হয়ে উঠল।

রাসবিহারী বসুকে অতখানি সম্মান দেব। রাসবিহারী বসু যেন এক দেব!—আমরা তার খরধার তরবারি হতে দীক্ষা নেব।

রাসবিহারীর জীবন আমাদের বলে, বলে জীবন চলে। না হলে মানব জীবন যায় জলে; সেরূপ জীবন-বিটপীতে সুফল নাহি ফলে।

রাসবিহারীর জীবন দ্বাপর যুগের রাসবিহারীর এই জন্মভূমির সন্তান আমাদের সকলকে বলে, কোন বাধাকে গাধার অপেক্ষা অধিক ব'লে গণ্য না ক'রে বাধাকে বধ ক'রে, শ্রেয় ও প্রেয় আমরা প্রাপ্ত হই আমাদের করে।

রাসবিহারীর জীবন জগৎকে বলে, বাধা দর্শন ক'রে যে ব্যক্তি ভয় পায়, বাত ধ'রে যায় জীবনের পায়; তার পায়-পায় অপায় তাকে পায়।

অতএব, শর সম অগ্রসর হও। চলো, চলো! 'জয়হিন্দ!' বলো!

আমাদের এই ধ্যান ধনে ধনী ভাবুক ভারত সেই সকাল হতে এই বিশ্বের পথে পথে এক মহাবিত্ত বিতরণ করছে।

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

অসৎ হতে আমাকে সৎস্বরূপে ল'য়ে যাও,
অন্ধকার হতে আমাকে জ্যোতিস্বরূপে ল'য়ে যাও।

মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতস্বরূপে ল'য়ে যাও।

—মন্দ হতে আমাকে মকরন্দ-আনন্দে নন্দিত কর।

রাসবিহারী বসু ও তাঁর এই দেশকে পরাধীনতার অন্ধকার পারাবার হতে আনন্দাধার স্বাধীনতার আলোর পথে, আলোর রথে সঞ্চরণ করাতে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় প্রহৃষ্ট ছিলেন। তাই রাসবিহারী হচ্ছেন ভাসবিহারী—আলোকবিহারী ;—আলো উৎসারী ;—কালো-বিদারী আলোসঞ্চারী!

পরাধীনতা তরবার তববার

ভারতের ভাতি, ভারতের বাতি নির্বাপিত করে দিয়েছিল বিদ্বেষী এক বিদেশী জাতি। ভারতকে করবার জন্য নিরন্ন ও বিবস্ত্র, তারা কৌশল ক'রে কেড়ে নিয়েছিল ভারতের হাতের অস্ত্র—অস্ত্র-আইন করে পাশ, ভারতের আত্মরক্ষার শক্তি করেছিল নাশ। একদা যেমন ভারতের ওপর এসে পড়েছিল শক, হূন, তেমনি এসে চড়াও হয়েছিল শ্বেতদ্বীপী শকুন।

রাসবিহারী বুঝেছিলেন, ঐ সকল দোষযুক্ত মন যে দুষমন তাদের করতে হলে দমন এবং ভারত হতে বিতাড়ন, চাই প্রহরণ—চাই অগ্নি-অস্ত্র।—অসির বল না হলে, ভারত-শশী পরাধীনতা-রাহুর গ্রাস মুক্ত হতে পারবে না। তার উপর অনল-অস্ত্রের আক্রমণ চালাতে না পারলে, পরাধীনতা পুড়ে ফেলবার কর্ম করা যাবে না।

বস্তুত অনল হচ্ছে মানুষের অমোঘ বল। অনল বলে, মারণ যন্ত্র চলে, আবার, তারণ-যন্ত্রও চলে। যে মানুষ, বা যে জাতি অনল বলে বলী তারা বহু বাধা দলি' অবাধে যায় চলি, তারা নিত্য নূতন অনল-যন্ত্র ক'রে আবিষ্কার, মানুষের অগ্রগতির পথ করে পরিষ্কার। তখন তাদের গতি হয়ে ওঠে দুর্বার।

প্রাচীনকালে ভারত বুঝতে পেরেছিল, অনল হচ্ছে ঐহিক এবং আত্মিক শক্তির আড়ত। তাই ভারত অগ্নি অর্চনায় আত্মনিয়োগ

করেছিল; দেবপূজাতেও অগ্নিকে প্রধান উপকরণ ব'লে বরণ করেছিল।

বর্তমানকালে, যে সকল জাতি চলে বিজয়-তালে, তারাও অগ্নি-বলেই তাই করে; তারা অগ্নিচালিত যন্ত্র ধরে জগৎ জয় করে। অগ্নিযন্ত্র উদ্‌ভাবনে তাদের অবিরাম প্রচেষ্টা ও প্রয়াস পূর্ণ ক'রে তোলে তাদের বহুবিধ আশা।

তাই বর্তমান ভারতে অগ্নি কেবলমাত্র দেবপূজা, এবং তত্তুল্য কার্যাদিতে প্রযুক্ত হলেই ভারতের ভাতি বিস্তার লাভ করতে পারে না। সেইজন্য চাই নিত্য নুতন অনল-বল-যন্ত্র উদ্‌ভাবন। ভারত যদি সেই কর্মে থাকে পরাঙ্মুখ, তা হ'লে, বিশ্ব সভায় মলিন হয়ে থাকবে তার মুখ, বল-সমৃদ্ধ হতে পারবে না তার বুক—সে বুক বিদেশী শত্রুর ভয়ে করবে সদা ধুকধুক; বিদেশীর দ্বারে দ্বারে সহায়তা প্রার্থনা ক'রে ক'রে ভারতকে থাকতে হবে অন্ধকারে প'ড়ে।

রাসবিহারী তাই অনল-বলের অবলম্বনের শুভ বুদ্ধিকে আশ্রয় করলেন,—তথাকথিত মিথ্যা শান্তির মিথ্যা যুক্তি আশ্রয় ক'রে, তুর্বলকে আশ্রয় দিলেন না।

রাসবিহারী বসুর চিন্ময় চিত্তদেশে ভারতকে স্বাধীন করার আকাঙ্ক্ষার অগ্নি উর্ধ্ব শিখায় দেদীপ্যমান ছিল। সেই অগ্নি তাঁকে দেখিয়ে দিল, অনল বল সঞ্চারে পরাধীনতাকে পর্যুদস্ত করিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারা যায় কালের পারাবারে। বিপ্লবী মানব প্লব স্বরূপ হয়ে পরাধীন জাতিকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে পারেন সোনার স্বাধীনতার পারে।

রাসবিহারী তাই বিপ্লবী পথের পথিক হলেন; বিপ্লবের পণব বাজালেন; বিপ্লবের বাণী বিমোচিত করলেন।

একদা রাসবিহারী ছিলেন একজন করণিক। সেই করণিকই আবার, একদা হলেন ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রশংসনীয় একটি কারণ।

একদা রাসবিহারী ছিলেন ভারত হতে জাপানে প্রবাসী। সেই প্রবাসীর প্রাণে সর্বদাই বাজত ভারতের স্বাধীনতার বাঁশী,—সেই প্রবাসী সর্বদাই ছিলেন ভরেতের ভাব ভাষী, ভারতের স্বাধীনতার বাণী বিস্তার প্রয়াসী।

জাপান প্রবাসী রাসবিহারীর দেহ ছিল সেই প্রবাসে, আর মনটি ছিল ভারত আবাসে।

ভারত ছিল তাঁর সাধ ও সাধনা ; ভারতই ছিল তাঁর স্বর্গ ও অপবর্গ ; ভারতই ছিল তাঁর ভর্গ।

ভারতের ইতিহাস সমুজ্জ্বল ভাসে

ভারতের ইতিহাসে, সমুজ্জ্বল ভাসে, বিকশিত সদা যাঁরা হাসে আর ভাষে, রাসবিহারী বসু তাঁদেরই, তাঁদেরই অন্যতম। রাসবিহারী অরিন্দম ; রাসবিহারী ভারতের অরিসংহারী ; রাসবিহারী ভারতী রস উৎসারী ; রাসবিহারী ভারতসেবার্থে পর্যটনকারী ; রাসবিহারী পর-দেশকে স্বদেশের মিত্রকারী ; রাসবিহারী সভ্যতার বহু ক্ষেত্র বিহারী।

ভারতের ইতিহাস মহাকাল সমুদ্র সকাংশ। এইখানে বেদ-উপনিষদ বিশ্বের অবিনশ্বর ভাস্বর সম্পদ ; এইখানে মহাভারত-রামায়ণ সর্বমানবের শিক্ষাদীক্ষা আনন্দের আয়তন ; এইখানে মঠ-মন্দির-চৈত্য প্রদান করে মানবের পরম পথ্য ; এইখানে চৌষট্টি কণায় মানবেরে ইহ-পরত্রের সমগ্র সামগ্রী বিলায়, এইখানে কালে কালে স্বাধীনতা সংগ্রাম নিত্য তোলে পৌরুষ-আহ্বান ; এইখানে নানাজাতি মেশে নিবিড় আশ্লেষে।

এই ভারতে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য করেন নিবয়নাশা রণনৃত্য ; এইখানে শিবাজী, বীরবেশে সাজি, আরেহিয়া বাজী, হন স্বাধীনতা

সংগ্রাম তরণীর মহান মাঝি ; এইখানে প্রতাপাদিত্য, রাণাপ্রতাপ ভারতের ভাতি-বাতি নির্বাপণ প্রয়াসীকে প্রদর্শন করেন অপ্রতিম প্রণাপ।

রাসবিহারী বসুও ঐসকলের মধ্যে গণ্য—অগ্রগণ্য সৈন্য, দূর করতে চান পরাধীনতা দৈন্য, মাতৃভূমিকে করতে চান ধন্য।

রাসবিহারী বসু ভারতের বসু—ঋদ্ধি। তিনি করেছেন ভারতের শ্রীবৃদ্ধি।

রাসবিহারী তাঁর স্বাধীনতা-হারা মাতৃভূমির জন্য আত্মহারা, পাগলপারা ; তাঁর রক্তধারা হাসে রুদ্রহাস, পরাধীনতার ঘটাতে প্রণাশ।

ভারতের স্বাধীনতার পতাকা যেন রাকা।

সেই রাকা পতাকা রাসবিহারীর দৃঢ় করে ভারতের স্বাধীনতা দৃঢ় করে বিঘোষিত করে বিশ্বের অম্বরে ঃ

স্বরাজ চাই! স্বরাজ চাই!
স্বরাজ বিনে শান্তি নাই ;
স্বরাজ বিনে কান্তি নাই ;
স্বরাজ বিনে এই জীবন
জীবন নয়—শুধুই বন!

সুবলদহে সবল মানুষ

সুবলদহ,— এটি একটি নাম। নামটি অসাধারণ নয় কি ?

সুবলদহ কিসের নাম ? একখানি গ্রামের নাম। গ্রামখানি কোথায় ? বঙ্গের বর্ধমান জেলায়, রায়না থানায়।

সুবলদহ কি সত্যই উত্তম বলপূর্ণ দহ ?

হ্যাঁ, সত্যই সুবল দহ ?

প্রমাণ ?

প্রমাণ এইস্থানে করা গেল প্রদান।

শীতকাল। শীতকালকে বলা যায় মানুষের হিত-কাল—শীত মানুষের কত হিতই না করে।

তখন শীতকালের প্রভাত বেলা। রবিকর করছে যেন সোনা ছড়ানোর খেলা।

সুবলদহ গ্রামের এক প্রৌঢ় ব্যক্তি। নাম কালীচরণ বসু। কালীচরণ সুবলদহের একটা খালের ধার দিয়ে চলেছেন এক আম্র-কাননের নিকট দিয়ে। চলতে চলতে তামাক খাচ্ছেন ফরসিতে সেই শীতে। ফরসির নলটি তিনি নিজের হাতে ধরছেন, ফরসিটি ধরে সঙ্গে চলেছে এক রাখাল বালক। তার মুখে যেন আনন্দের ঝলক। বালকের স্কন্ধে রয়েছে কালীচরণ বসু মহাশয়ের বস্ত্র, বেনিয়ান আর গামছা।

কৃষকেরা চলেছেন মাঠে নানারূপ শস্য ও ধান্য উৎপাদন ক'রে দেশ ধন্যধন্য করার জন্য। তাঁরা, কালীচরণকে দর্শন ক'রে, হর্ষ সহকারে নমস্কার করলেন।

সহসা বহু মানুষের কোলাহল ধ্বনি কালীচরণের কর্ণে প্রবিষ্ট হল। কালীচরণ দণ্ডায়মান হলেন। দেখলেন বহু লোক আসছে সেই দিকে। একটু পরেই, সেই কোলাহলকারীরা কালীচরণের নিকটে এসে পড়লেন।

কালীচরণ সেইসব লোকজনকে তাঁদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, তাঁরা তাঁদের ছেলের বিবাহের জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহ সম্পন্ন হয় নি। হয়েছে কন্যাপক্ষের সঙ্গে মতভেদ। তাই তাঁরা তাঁদের ছেলে নিয়ে ফিরে এসেছেন।

কালীচরণ ক্ষণকাল একটু চিন্তা করলেন। তারপরেই বলে উঠলেন, আপনারা ত ফিরে এলেন। কিন্তু কন্যা পক্ষের সেই বাগ্‌দত্তা কন্যাটির ভবিষ্যৎ ভেবেছেন কি?—আমাদের সমাজে সেই মেয়েটির বিবাহ হওয়া সহজ হবে কি?

বরপক্ষের একজনে তখন এমন দুই একটা বাক্য বর্ষণ করলেন, যে বাক্য ভদ্রজনের কর্ণের পীড়া উৎপাদন করে।

কালীচরণ কঠোর হয়ে উঠলেন। ব'লে উঠলেন তিনি, আমি আপনাদের এই ব্যাপার সম্বন্ধে বিচার করব। এইখানেই আমাদের আদালত বসবে, এখনই বসবে। আপনারা প্রথমে আমাকে বিচারে পরাস্ত করুন। অতঃপর আপনাদের পাত্রসহ গমন করুন। আপনারা যদি বিচারে পরাভূত হ'ন তা হ'লে সেই পাত্রীটির সঙ্গেই আপনাদের এই পাত্রের পরিণয় সম্পন্ন করাতে হবে।— এর আর অন্য পথ নেই।

ঐ কথা শ্রবণ ক'রে, কালীচরণের সঙ্গের বালকটির চিত্ত যেন নেচে উঠল ধেই ধেই। সে ভাবল, এত বড় মজার ব্যাপার!

কিন্তু বরপক্ষ তখনও নরম নয়,—গরম। তাঁরা কালীচরণ বসুর বাক্যে অনাদর প্রদর্শন ক'রে, নিজদের গন্তব্যপথে পদক্ষেপ করতে উদ্যত হ'ল। আর তখনই ধ্বনিত হয়ে উঠল কালীচরণের কঠোর কণ্ঠের হুংকার: খবরদার! খবরদার!

ক্ষেত্রে কৃষি-কর্মরত বহুলোক সেই কঠোর কণ্ঠস্বর শ্রবণে তখনই ধেয়ে এল সেইখানে।

বরপক্ষ হয়ে পড়ল হীনবল, নিশ্চল।

সেই আমবাগানই তখন হ'ল ধর্মাধিকরণ। সুবলদহের সকল ব্যক্তি সেই কালীচরণ বসুর নির্দেশ অনুসারে, লোক চ'লে গেল কন্যাপক্ষের ভবনে।

স্বজন সমভিব্যাহারে কন্যা এসে গেল। কালীচরণ বসু নিজে সেই পাত্রীকে সম্প্রদান করলেন পাত্রের করে। পরিণয় সুসম্পন্ন হ'ল।

বিবদমান কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষকে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করে, কালীচরণ বসু ব'লে উঠলেন যুক্ত ক'রে—আমি আপনাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

আবার উভয়পক্ষ ব'লে উঠল, আমরা নিতি নিতি আপনার প্রীতি-প্রার্থী।

ঐ উভয় পক্ষকে ভোজনে আপ্যায়িত ক'রে তাঁদের স্বজন ক'রে তুললেন দরিদ্র কালীচরণ বসু।

কে ঐ কালীচরণ বসু? তিনি আর কেউ নন, রাসবিহারী বসুর পিতামহ মহাশয়।

কালীচরণ বসু লাঠি খেলায় সুদক্ষ ছিলেন। তিনি জানতেন, যার লাঠি, তার মাটি!—আয়ুধ আয়ুদ!—যে ব্যক্তি, কিংবা যে জাতি অস্ত্রচালনায় শক্ত, সেই লাভ করে জগতের তক্ত, জগৎ হয়ে পড়ে তার ভক্ত ও অনুরক্ত।

কালীচরণ বসু মোটেই ধনী ছিলেন না। কিন্তু যখন বেজে উঠত তাঁর কণ্ঠধ্বনি রণরণি, তখন মানুষ, প্রমাদ গণি হয়ে পড়ত বেসামাল। পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের মানুষ কালীচরণের তুলনায় নিজদের ফানুস অপেক্ষা অধিক ব'লে জ্ঞান করত না। তাদের মধ্যে যখনই হত কোনরূপ বিবাদ, অথবা বিষাদ, তখন কালীচরণই হতেন তাদের স্মরণ। দেখা যাবে, ঐ পিতামহের পৌরুষ পৌত্র রাসবিহারীর মধ্যে প্রোজ্জ্বল।

রাসবিহারী শৈশবেই মাতৃহারা হন। কিন্তু কালীচরণ বসুর পত্নী, অর্থাৎ রাসবিহারীর পিতামহী, তখন রাসবিহারীকে মাতার ন্যায় লালন পালন করতে লাগলেন।

রাসবিহারীর পূর্বজগণ

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রায়না থানা। রায়নার অন্তর্গত সুবলদহ গ্রাম। রাসবিহারীর পূর্বজবৃন্দ সুবলদহের অধিবাসী।

বর্ধমানের প্রসঙ্গ উত্থিত হলেই, মনে হবে,

মানে মানে বর্ধমান
অতিশয় শোভমান।

বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন কত বীর, কত ভক্ত সাধক,

কত কবি, কত কর্মী, কত না জ্ঞানী ও গুণী! কোন কোন বঙ্গকাব্যে বর্ধমান হয়ে আছে বহু মান সম্পন্ন।

ক্ষুদ্র গ্রাম সুবলদহ। কিন্তু রাসবিহারী বসুর জন্মগ্রাম ব'লে, সুবলদহ মানুষের সম্মান পাবে অহরহ।

রাসবিহারী বসুর পূর্বজবৃন্দ ছিলেন বৈঁচীতে; তারপরে সিঙ্গুরে; তারপরে তাঁরা আগমণ করেন সুবলদহে।

নিধিরাম বসু রাসবিহারীর পূর্ববর্তী পঞ্চম পুরুষ। শ্রুত হওয়া যায়, নিধিরাম সর্বপ্রথম সুবলদহের ক্রোড়ে জীবনযাপন করেন। নিধিরামের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র রামমোহন। রামমোহনের তিন পুত্র—দুর্গাচরণ, কালীচরণ, শ্যামাচরণ। কালীচরণের পুত্র বিনোদবিহারী। বিনোদবিহারীর পুত্র ও কন্যা, যথাক্রমে: রাসবিহারী, বিজনবিহারী, বঙ্কিমবিহারী ও সুশীলা (কন্যা)।

দুর্গাচরণ বসুর পরলোক প্রাপ্তির পরে, কালীচরণ বসু হন বংশের কর্তৃপুরুষ। শ্যামাচরণ বসু ভ্রাতার প্রতি পরমশ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই বসুগণ একদা বেশ সঙ্গতিসম্পন্নই ছিলেন। কালীচরণ বসুর মানসিক বল প্রবল ছিল, অমিত ব্যয়িতাও প্রবল ছিল। দানে তিনি ছিলেন যেন ছোটখাট একটি দাতাকর্ণ বা বলি। তাঁর সেই দান তাঁকে দান করেছিল বিপুল মান।

সুবলদহের এই বসুবৃন্দ ছিলেন আশেপাশের কয়েকখানি গ্রামের সকলেরই বন্দিত।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারীর আবির্ভাব

রাসবিহারী বসুর জন্ম, যেন এই কলিকালে দ্বাপর যুগের রাসবিহারীর জন্ম।

দ্বাপর যুগের রাসবিহারী অত্যাচারী কংসারি, বিশ্ব মানবের মিতা গীতা উৎসারী, সাধুর হর্ষণ, এবং অসাধুর ধর্ষণ স্মুদর্শন-ধারী।

আমাদের ভারত রাগরঞ্জিত রাসবিহারীও দুষ্টের শত্রু, শিষ্টের মিত্র।

তিনি সাহিত্যিক, প্রচারক, পর্যটক, চিন্তানায়ক, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মৈত্রী সংস্থাপক। তাঁর জীবন যেন পাবন পাবক!—প্রোজ্জ্বল পাবক!

মনে পড়ে, শ্বেতদ্বীপী ইংরাজের গ্রাসগত ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার করার জন্য ১৮৫৭ সালে ভারতের সুসন্তান সিপাহীরা অস্ত্র উত্তোলন করেন, আঘাত হানেন সেই ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী হানাদারদের উপর। সেই অভ্যুত্থান, সেই সংগ্রাম ভারতকে দান করেছে মান, করেছে গৌরবে শোভমান।

তারপরে, ক্রমে ক্রমে কাল কেটে গিয়ে, এসে গেল ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ। এসে গেল মে মাস। রৌদ্র তখন খর-প্রখর—সৌরকর যেন দগ্ধ করছে চরাচর।

সুবলদহ গ্রামে কালীচরণ বসুর পর্ণ-কুটির। সেই কুটীরের সংলগ্ন গোশালা। সেই দিবসটি ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের মে মাসের পঞ্চবিংশতি দিবস ২৫শে মে। সেই পর্ণ-কুটির সংলগ্ন গোশালায় এক মহালগ্নে মাতৃক্রোড়ে আবির্ভূত হ'ল একটি শিশু।

কে সেই শিশু?

সেই শিশু রাসবিহারী বসু।

রাসবিহারীর আবির্ভাবে, সেই পর্ণ কুটীর যেন হয়ে গেল স্বর্ণ-কুটীর !—কিন্তু তখন সেটি কাহারও অন্তরগোচর হয়নি।

রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী তখন কোথায় ?

সিমলায়।

তিনি তখন সামান্য সরকারী কর্মী। তিনি কি তখন অনুভব করেছিলেন, যে তিনি হলেন তাঁর পিতা, যিনি হবেন স্বাধীনতার অসামান্য সংগ্রামধর্মী ?

দরিদ্র গ্রামে দরিদ্র পরিবার। সেই পরিবারে প্রাদুর্ভূত হলেন স্বদেশকে ধন্য করার ধনে ধনী সংগ্রামী দুর্বার।

কথায় বলে,

জন্ম হোক যথা-তথা',
কর্ম হোক ভালো।

দরিদ্র গ্রামের দরিদ্রের পুত্র রাসবিহারী হয়েছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাণ্ডারী।

মহাভারতোক্ত দাতাকর্ণ—মহাবীর কর্ণ—মহীয়সী মাতা কুন্তীর ক্রোড়বিচ্যুত পুত্র কর্ণ—মহাভারত মহাকাব্যে স্বর্ণবর্ণে বিরাজমান। কর্ণ বলেছিলেন,

কুলে জন্মগ্রহণ দৈবের আয়ত্ত ; পৌরুষ আমার আয়ত্ত।

রাসবিহারীও ভারতের স্বরাজ অর্জনের মহাকাব্য ক্ষেত্রে পাবকোপম পৌরুষ প্রভায় প্রদীপ্যমান।

এখন যে আছে শিশু ভবিষ্যতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উঠবার পরে স্বভাব-চরিত্র কিরূপ হয়ে উঠবে, এখন হতেই তার কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ একটি কথা প্রচলিত রয়েছে।

ঐ কথা যে কিছু পরিমাণে সত্য, তাতে সংশয় নেই।

শিশু রাসু—শিশু রাসবিহারী বসু—শৈশবে কিরূপ ছিলেন ? কিরূপ খেলা তিনি খেলতে ভালবাসতেন ? কি খাদ্য তাঁর প্রিয় ছিল ? তিনি শান্ত স্বাভাবের ছিলেন, না, তার বিপরীত ভাবের ছিলেন ?

ঐ সব প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাস নিরুত্তর। রাসবিহারীর বাকী ইতিহাস কেউ লিপিবদ্ধ ক'রে রাখেনি।

কিন্তু এটি মনে করে নেওয়া যায়, যে শিশু রাশু নিরীহ ধরণের ছিলেন না, অলস প্রকৃতির ছিলেন না, কুণো প্রকৃতির ছিলেন না ; তার শৈশব জীবন নিশ্চয়ই ছিল তরঙ্গবৎ—তরঙ্গ-রঙ্গ-বহুল।

শিশু রাসু শৈশবেই মাতৃহারা হন।

রাসবিহারী-রূপ রত্ন প্রসবিনী রাসবিহারীর মাতা কিরূপ প্রকৃতির ছিলেন ?

তিনি সতত সদ্ভাবশীলা, সাহসিকা, দৃঢ়চেতা, পরার্থ পরায়ণা, এবং সতত কর্ম পরায়ণা ছিলেন,—এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না।—তার সন্তানের প্রকৃতিই সেই সবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

নিঃস্ব হয়েও ভীষ্ম

(রাসবিহারীর পিতা)

বিনোদবিহারী বসু রাসবিহারী বসুর জনক ছিলেন।

রাসবিহারীর পিতাও ছিলেন তেজস্বী। তিনি দরিদ্র চাকরিজীবী হয়েও, চাকরির চাকার সঙ্গে নিজের জীবনটি গ্রথিত ক'রে দিয়ে নিজের জীবনকে ফাঁকা বা অন্তঃসারশূন্য ক'রে তোলেন নি। পৌরুষের পাবক তাঁর জীবনটিকে ক'রে রেখেছিল যেন এক শক্তিসাধক।

বিনোদবিহারী বঙ্গের সরকারী দপ্তরের কর্মী ছিলেন। ঘুষকে তিনি তুচ্ছ ব'লে গণ্য করতেন। ওপরওয়ালার কৃপা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চাটু বাক্য প্রয়োগকে তিনি ছেঁড়া চটিজুতা অপেক্ষা অধিক ব'লে গণ্য করতেন না। যাহা কিছু তাঁর কর্তব্য, সেই ছিল তাঁর জীবনের হব্য-কব্য।

পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর অঞ্চলের নিকটবর্তী একখানি গ্রাম। তার

নাম পাড়েলা। পাড়েলায় ছিল বিনোদবিহারীর প্রথম শ্বশুরালয়। নবীনচন্দ্র সিংহ মহাশয় ছিলেন বিনোদবিহারীর শ্বশুর এবং রাসবিহারীর মাতামহ। বিনোদবিহারীর খুল্ল-শ্বশুব মহাশয় বিনোদবিহারীকে সরকারী কর্মের কর্মী করে দেন।

বিনোদবিহারীর হৃদয়দেশ ছিল নির্মল। অন্তরে ও বাহিরে তিনি ছিলেন শুচি। শুচি ছিল তাঁর রুচি।

বিনোদবিহারীর বেশভূষার একটু পরিপাট্য ছিল। তাঁর সেই ভাবটি তাঁর বন্ধুদের নিকট তাঁকে একটু উপহাস-রসিকতার পাত্র করে তুলেছিল। তাঁরা বিনোদবিহারীকে "কুপুড়ে বাবু" বলে রসিকতা করতেন।

একবার বিনোদবিহারী শ্বশুর গৃহে গমন করেছেন। পুষ্করিণীতে স্নানান্তে জামা-কাপড়ের জলুস দর্শনে, তাঁর এক আত্মীয়া এমন একটা মন্তব্য করলেন, যে সেই মন্তব্য বিনোদবিহারীর মর্মদেশ বিদ্ধ করল। সেই মন্তব্যের মধ্যে শ্বশুরকুলের সাহায্যে বিনোদ-বিহারীর সরকারী চাকরি প্রাপ্তির একটা খোঁচা ছিল। বিনোদ-বিহারী তখন আর শ্বশুর ভবনে অবস্থান করলেন না; সেখান হতেই প্রস্থান করলেন রেল স্টেশনে। কিন্তু ট্রেন পেলেন না। না পেলেও দমবার পাত্র তিনি নন। চরণ চালিয়ে দিলেন কলিকাতা অভিমুখে।

তারপর সরকারী চাকরিতে পরিত্যাগ-পত্র পেশ করলেন।

সে ব্যাপার জানাজানি হয়ে যেতে বিলম্ব হল না। তাঁর খুড়শ্বশুর মহাশয়, আত্মীয়রা. বন্ধুরা তাঁকে দুঃখজনক কঠোর সংকল্প হতে চ্যুত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বিনোদ বিহারী তখন হলেন যেন অচ্যুত—সংকল্পে অটল। অন্যত্রও তাঁর চাকরি প্রাপ্তির চেষ্টা ফলবতী হ'ল না। তখন একদিন তিনি সিমলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। রেলগাড়ীর পাথেয় তাঁর নেই। তাই চললেন পদব্রজে।

চারিধার হতে তাঁর উপর বর্ষিত হল কটূক্তি আর ভর্ৎসনা।

কিন্তু একটিমাত্র মাত্র মানুষ তখন বিনোদবিহারীর বজ্র কঠোর দৃঢ়তা দর্শনে উচ্ছ্বসিত মনে অভিমত পরিব্যক্ত করলেন ঃ মানুষের প্রাণ আত্মসম্মান জ্ঞান দ্বারা হয় শোভমান। পশুর মধ্যে সেই জ্ঞান অবিদ্যমান। মানুষ সেই জ্ঞানের গৌরবে মহীয়ান।

ঐ অভিমত প্রকাশক মানুষটি হচ্ছেন বিনোদবিহারীর পিতা কালীচরণ।

বিনোদবিহারী বসুর পৌরুষ-পরিচয় কেবলমাত্র ঐ একটি ঘটনাতেই নয়।

বিনোদবিহারী সিমলায় গমন করলেন। সেখানে সরকারী কর্ম লাভ করলেন।

নির্ভীকতার ভাস্বর

বিনোদবিহারীর দৃঢ়তারই হ'ল জয়।

সিমলায় সরকারী চাকরি করার সময়ে, বিনোদবিহারী একদিন অবগত হলেন, পুলিশ তাঁর বাসস্থানে খানা-তল্লাসি চালাবে। বিনোদবিহারীর বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র রাসবিহারীর ব্যাপার নিয়েই চালান হবে সেই খানা-তল্লাসি।

দরিদ্র বিনোদবিহারী যথা সময়ে কর্মস্থলে গমন করলেন। লেখনী ধারণ করলেন। একখানি আবেদনপত্র বিরচিত হ'ল।

সেই পত্রের মর্ম বিনোদবিহারীর মর্মকথা এইরূপে প্রকাশিত করল ঃ

আমি দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারের সেবা ক'রে আসছি। আমার টুঁটি টিপে ধরার মত আমার কোন ত্রুটি আমার চাকরি ক্ষেত্রে এযাবৎ প্রকাশ পায় নি।—আমার এমন কোন গলদ প্রকাশ পায় নি যার ফলে একটা গলাধাক্কা পাওয়াই আমার প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। আমার পুত্র রাসবিহারী বসু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত, তার মর্ম তাকে যে কর্মে প্রণোদিত করেছে, সে সেই কর্ম করেছে। তার সেই কর্ম

আমার উপদেশ কিংবা আদেশ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় নি। তথাপি, তাঁর সেই কর্মের জন্যে সরকার যদি আমাকে সন্দেহ করেন এবং আমার বাসস্থানে খানাতল্লাসি চালান, তা হ'লে, ক্ষুণ্ণ হবে আমার সম্মান ; এবং আমার দ্বারাও আর সরকারের কর্ম শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পাদিত হতে পারবে না। এরূপ অবস্থায়, হয় সরকার আমার ভবনে খানাতল্লাসি চালানো বন্ধ করুন, না হয়, আমার চাকরি-ত্যাগপত্র গ্রহণ করুন।

ঐ পত্র প্রাপ্ত হয়ে, সরকার দেখলেন, তাঁদের সেবক বিনোদ-বিহারী বক-ধার্মিক নন, তিনি পাবক ;—তিনি ক্ষুদ্র হলেও শূদ্র নন, তিনি অমিত তেজা।

খানাতল্লাসি আর হ'ল না। বিনোদবিহারীর উপর হতে বিদেশী সরকারের পুলিশের দৃষ্টি অপসৃত হ'ল।

বিনোদবিহারীর ন্যায়নিষ্ঠ মনোবল তাঁর জীবনটিকে ক'রে ফেলল যেন এক ঝলমল শতদল।

মাতা নয়—মমতায় মাতা

রাসবিহারী বা রাসু যখন শিশু, তখন তাঁর জননী তাঁর ইহজন্মের জীবন পরিত্যাগ ক'রে পরলোক পথে পদার্পণ করেন।

কিন্তু রাসবিহারী মাতৃহারা হয়েও মাতৃহারা হলেন না। শ্যামাচরণ বসুর দ্বিতীয়া পত্নী স্নেহ-মমতায় ছিলেন অদ্বিতীয়া। তিনিই তখন হলেন মাতৃহারা শিশু রাসুর মাতা। তাঁর নাম বিধুমুখী। এই বিধুমুখী স্নেহ-মমতায় ছিলেন যেন সত্যই বিধুমুখী—মধুমুখী।

বিধুমুখীর সতীনও ছিল। কিন্তু সতীনে-সতীনে সখ্যভাবই সারা জীবনই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, পরস্পরে ভক্ষ্য ভাব ছিল না, ছিল না অনৈক্য ভাব। কারণ তাঁরা ছিলেন সতী, এবং সৎ-ই, স্বচ্ছ ছিল তাঁদের মতি, অনাবলি ছিল তাঁদের জীবনের গতি।

বিধুমুখী ছিলেন অতিশয় বুদ্ধিমতী, সেই সঙ্গেই ছিলেন

তেজস্বিতায় যেন এক দ্যুতি। আবার, কোমলতায় তিনি ছিলেন কমলা।

বালক বালিকা. যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সকলকেই সেই বিধুমুখী নিজগুণে করতেন সুখী।

শিশু রাসুর মন যখন করত কোন আকিঞ্চন, বিধুমুখীর ক্রোড়স্থ হলেই, সে সব হয়ে যেত পূরণ—শিশু রাসুর পক্ষে বিধুমুখী যেন ছিলেন এক কল্পতরু—মাতৃহীন শিশুর জীবন-মরু বিধুমুখীর মধ্যে লাভ করেছিলে যেন একটি পান্থপাদপ।

কোন প্রকার অসুবিধা যখন শিশু রাসুকে বিদ্ধ করত, বিধুমুখীর কমল-কর সেই অসুবিধার কণ্টক উৎপাটন করত।

বিধুমুখীর মমতা ও মায়া হয়েছিল মাতৃহীন শিশু রাসুর পক্ষে সুশীতল ছায়া!

সুবলদহের সবল ছেলে

রাসবিহারী অধ্যবসায় বলে বিদ্যাকে নিজের বশীভূত করেছিলেন।

কোথায় রাসবিহারীর বিদ্যারম্ভ হয়?

রাসবিহারীর বিদ্যারন্ধ হয় সুবলদহের পাঠশালায়।

সেই যুগে, এদেশের শিক্ষার্থীর হস্তে কেবল মাত্র কলম প্রদত্ত হত না, বলমত্ত প্রদত্ত হত—লাঠিও প্রদত্ত হত।—কারণ, যার লাঠি, তার মাটি।—যার হাতে নেই লাঠি, তার জীবন হয়ে যায় মাটি!—কেবলমাত্র পুঁথির বলে জীবন-পথের পথিক ঠিকভাবে চলতে পারে না, প্রহরণ-বলও তার চাই!—যার হস্তে থাকে না প্রহরণ, তাঁর জীবনের সর্বস্বধন পরে করে হরণ।

লাঠি খেলা, নানারকম ডন-কুস্তি-কসরত সেই যুগে ছিল শিক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্যবৎ।

রাসবিহারী বসুর পিতামহ কালীচরণ বসু তাঁর স্নেহ-পাত্রদের

সর্বপ্রকার শিক্ষার ভার পরের হস্তে প্রদান ক'রে নিদ্রা যান নি আরাম ক'রে।

কালীচরণ তাঁর পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষা দিতেন সদাচরণ, শিক্ষা দিতেছ ব্যায়াম।—ব্যায়ামকে বলা যায় একপ্রকার পুষ্টিকর আম।—ব্যায়াম ব্যারামকে বধ করে, জীবনকে আমের মতো রসালো করে।

কালীচরণ বসু প্রায়ই তাঁর স্নেহ-পাত্রদের বলতেন, তোমাদের থাকা চাই কুলীনের নয়টি গুণ, তা না হ'লে তোমাদের জীবনে ধরবে ঘুণ—সব গুণ হয়ে যাবে খুন—জীবন হয়ে পড়বে বেবুন—বৃথা—একদম বৃথা—অন্তঃসারশূন্য।

কালীচরণ বসু মহাশয় নিজেই সকলকে লাঠিখেলা বা সেই খাঁটী খেলা শিক্ষা দিতেন; জীবন-তরী চালনায় মহড়া হিসেবে, নৌ-চালনা শিক্ষা দিতেন; সংসার সমুদ্রে সন্তরণের শিক্ষা হিসেবে, সন্তরণও শিক্ষা দিতেন।

লাঠি খেলায় কালীচরণ ছিলেন সেই অঞ্চলে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর হাতে যখন বিঘূর্ণিত হত লাঠি, তখন, এমন কি, প্রায় একশ লোকেরও লাঠি নিজেদের যেন মনে করত তুচ্ছ মাটি।

কালীচরণ প্রায়ই নানারূপ ব্যায়ামের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতেন।

উৎসাহ দান ক'রে সকলকেই এক একটি শহি ক'রে তুলবার—বাদশাহ বা রাজা ক'রে তুলবার—ইচ্ছা করতেন যেন তিনি। একদিন লাঠি খেলার এক প্রতিযোগিতা। বিচারকরূপে আসনে অসীন কালীচরণ স্বয়ং।

লাঠিখেলায় রাসবিহারী ছিলেন ওস্তাদ; রাসবিহারীর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পুত্রও ছিলেন দক্ষ। লাঠিখেলায় উভয়ে ছিলেন সমকক্ষ।

লাঠি খেলায়, তখন দুইটি দল। একটি দলের মধ্যে খেলায় রাসবিহারীর জ্যেঠামহাশয়ের পুত্র হলেন সর্ববিজয়ী।

অন্য দলটির খেলায়, রাসবিহারী প্রাপ্ত হলেন শীর্ষস্থান।

এইবার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল দুই দলের দুই বিজয়ীর মধ্যে।

ভাই-ভাই প্রতিযোগিতা সংগ্রাম।—সে এক দৃশ্য অতি অভিরাম।

দুই ভ্রাতার মধ্যে, কনিষ্ঠ রাসবিহারী ভ্রাতার হাতের পুনঃ পুনঃ অক্রমণে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন প্রাণপণে।

তারপরে, ক্রীড়ার মত্ততাও, জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁর কনিষ্ঠের উপর হানলেন কঠিন আঘাত।

এইবার রাসবিহারীর ধমনীর রক্ত হয়ে উঠল যেন মত্ত, তাঁর লাঠি হ'ল যেন প্রমত্ত।

প্রমত্ত দণ্ডাঘাত রাসবিহারীর প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ক'রে ফেলল ভূতলে পপাত।

রাসবিহারী হলেন বিজয়ী। পরে দেখা যাবে, রাসবিহারী সর্বত্রই জয়ী—বিজয়ী!

বিজয়ী রাসবিহারী তখন লাভ করলেন বিচারকের আলিঙ্গন; লাভ করলেন তাঁর গলার পুষ্পহার।

সেই হতেই কি রাসবিহারীর জীবনের গতি হ'ল চির দুর্বার?

ভয় যার নিকট হতে দূরে রয়, পরাজয় তাঁর পদতলে প'ড়ে রয়।

রাসবিহারীর.জীবন সেইরূপ ‚গৌরবে সৌরভময় জয়-রব ময়!—জয়-রব ময়!

সুবলদহের সবল ছেলে রাসবিহারী।

যারা যথার্থ মানুষ হয়ে উঠতে চায়, ফানুস হয়ে উঠতে না চায়, তারা বলে, সুবলদহের সবল ছেলে রাসবিহারী আমরা যেন তাঁর মতো হয়ে উঠতে পারি।—আমাদের লাঠির বাড়ি দেয় যেন আমাদের স্বদেশের শত্রুকে বিতাড়ি।

বিদ্যার্থী রাসবিহারী

রাসবিহারী জননীর পরলোক গমনের পরে, রাসবিহারীর এক নব-মাতা এলেন তাঁদের ঘরে। তিনি রাসবিহারীর বিমাতা।

কিন্তু রাসবিহারীর বিমাতা, প্রকৃতপক্ষে, রাসবিহারীর স্ব-মাতা অপেক্ষা কিছু কম হননি। রাসবিহারীর মাতার শূন্যস্থান তিনি পূর্ণ করেছিলেন স্নেহদানে, মমতা দানে, অমৃত মাতৃ দৃষ্টিদানে।

রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী তখনকার ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে একখানি বাড়ী সংগ্রহ করলেন। তখন রাসবিহারী চন্দননগরে আগমন করলেন।

রাসবিহারী ইংরাজী শিক্ষার বিদ্যালয়ের ছাত্র হলেন। তারপরে মেধাবী রাসবিহারী একসঙ্গে দুইটি শ্রেণী অতিক্রম করলেন।

দৈহিক দিক দিয়ে সবল রাসবিহারী সেই "ডাব্‌ল্ প্রমোশন" পেয়ে, প্রমাণিত করলেন যে, তিনি কেবলমাত্র কায়িক বলে বলীয়ান্ নন, মানসিক বলেও বলীয়ান।

তিনি তাঁর শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার্থীরূপে গণ্য হয়ে উঠলেন। সহাধ্যায়ীরা রাসবিহারীকে তাদের নেতা বলে বরণ করতে লাগল। শিক্ষকমণ্ডলীর স্নেহস্নাত হয়ে উঠতে লাগলেন রাসবিহারী।

কিন্তু কিশোর ছাত্র রাসবিহারী, কেবল মাত্র তোতাপাখীর মতো পাঠ মুখস্থ করেই তৃপ্তিলাভ করলেন না। তিনি হলেন পাঠের ক্ষেত্রেও ন্যায় অন্যায়ের বিচারশীল শিক্ষার্থী।

"ইতিহাস, না, ছাইপাঁশ"

অল্প দিন পরেই একদা দেখা গেল, যোগীর ন্যায় মনযোগী ছাত্র বিদ্যালয়ের প্রিয়পাত্র রাসবিহারী পাঠে যেন অমনযোগী হয়ে উঠেছেন।

রাসবিহারীর উপর তখন বর্ষিত হতে লাগল ভর্ৎসনা ; তিরস্কার তাঁকে তীরের মতো আঘাত করতে লাগল। কিন্তু রাসবিহারী তথাপি অমনযোগীই হয়ে রইলেন।

কেন ?—কি কারণে ?

রাসবিহারীর নব মাতা বিমাতা একদিন রাসবিহারীকে বিশেষ ভাবে বললেন তাঁর মনের নিগূঢ় অবস্থাটা প্রকাশিত করবার জন্যে।

রাসবিহারী যেন কতকটা স্বগত-উক্তির মতো বলে উঠলেন, ১৭জন ঘোড়সওয়ারের কেচ্ছা কি সাচ্চা ?—ওসব কি "ইতিহাস, না, ছাইপাঁশ ?"

রাসবিহারীর বিমাতা ঐ বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থটা উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি পুনর্বার প্রশ্ন করলেন রাসবিহারীকে।

ছাত্র রাসবিহারী ব'লে উঠলেন, মা, ইতিহাসের বইয়েতে লিখেছে, বিদেশ হতে ১৭ জন আক্রমণকারী এল এবং বাঙ্গালা দেশটা দখল করে ফেলল।

ঐ দখল করার কাহিনী বঙ্গবিদ্বেষী খলের কাহিনী। তাই নয় কি ?

বঙ্গ সন্তানকে ভীরু বা ফেরু ব'লে প্রমাণিত করা—বঙ্গ-সন্তানের আত্মপ্রত্যয়ের লাঘব করা,—এ উদ্দেশ্যটা ছাড়া ঐ অসম্ভব কাহিনী কি ক'রে সম্ভব হয় ?

রাসবিহারীর নব মাতা বিমাতা বলে উঠলেন, রাবণের ঘরের

শত্রু হ'ল তার ভাই বিভীষণ। তাই তো শেষ পর্যন্ত হল রাবণ নিধন, আর রাবণের স্বর্ণ-লঙ্কার পরহস্তে পতন। বঙ্গদেশেও "বিভীষণ" তখন ছিল নিশ্চয়। তাই হয়তো হয়েছিল এইরূপ পরাজয়।

রাসবিহারী সজোরে মস্তক সঞ্চালন করলেন।

না-না-না। এইরূপ হ'তে পারে না।—এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।—আমি ঐ "ছাইপাঁশ ইতিহাস"-এর প্রতিবাদ করছি—ঐ নিয়ে বিবাদ করেছি সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে; তর্ক করেছি পূজনীয় শিক্ষক-গুরুজনদের সঙ্গে।

তার ফলে, আমাকে বলা হয়েছে মূঢ়, বলা হয়েছে দিগ্‌গজ গজ মূর্খ।

বিদ্যা—লয় করার ঐ বিদ্যালয়ে আমি আর হব না ছাত্র। নই কো আমি তেমন পাত্র।

যা হচ্ছে সত্য, তাই হচ্ছে মানবের পক্ষে পথ্য।—সত্য—চাই সত্য—প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই।

রাসবিহারীর বিমাতা দেখলেন, তাঁর স্নেহের ধন রাসবিহারী যেন সেই অতীতকালের রাসবিহারী—চক্রধারী!—সর্বপ্রকারের অন্যায়ের অরি—সর্বপ্রকার সাধুতার কাণ্ডারী।

রাসবিহারী সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে আর রইলেন না।

কিশোর রাসবিহারী, সত্য-উদ্ধারের জন্যে, তখন হতেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। মিথ্যার নিকটে আত্মমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দিতে চাইলেন না।

তাঁর সেই দৃষ্টান্ত মানুষের মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করল পুরা-কালের প্রহ্লাদকে—সজ্জনগণের সেই আহ্লাদকে!

বীরত্বের পথে বিলাতী বাধা

রাসবিহারী এলেন কলিকাতায়। কলিকাতাস্থ ঠনঠনিয়া অঞ্চলের নিকটে তাঁদের বাড়ির কেউ কেউ থাকতেন। রাসবিহারী তাঁদের সঙ্গেই অবস্থান করলেন।

একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। পাঠাভ্যাস চলতে লাগল। গুরুজনরা স্বস্তিবোধ করলেন।

কিন্তু একদিন সহসা সকলে লক্ষ্য করলেন, ছাত্র রাসবিহারী সন্ধ্যার পরেও বাসস্থানে নেই।

তারপরে, অনেক সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও, রাসবিহারীকে দেখা গেল না।

সকলে অস্থির হলেন। একটু শঙ্কিত হলেন। কেউ কেউ একটু ভীত হলেন।

রাসবিহারী গেল কোথায়?—গেল কোথায়?—আপন জনদের মুখে ঐ ব্যাকুল-বাণী।

সন্ধান চলতে লাগল নানা ভবনে, নানা রাজপথে; পার্কে বা উদ্যানে।

সন্ধান চলল নানা দাতব্য চিকিৎসালয় বা হাসপাতালে।

কিন্তু কোথায় রাসবিহারী!

কেউ কেউ বলতে লাগলেন, চা-বাগানের কাজের শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য আজকাল আড়কাঠি তো কলিকাতায় ঘুরে বেড়ায়, পয়সা রোজগারের পথ দেখায়! রাসবিহারী কি সেই আড়কাঠির ফাঁদে পড়ল? চা-বাগানে যাওয়ার পথ ধরল?

রাত্রি হতে লাগল নিবিড়! রাসবিহারী তবু বাসস্থানে এল না। রাসবিহারীর আপন জনগণ তাই ক্রমেই হতে লাগলেন অস্থির, অধীর।

তখন কি আর করতে পারেন তাঁরা? আকাশে দেখা যেতে লাগল তারা। রাসবিহারীর আপন-জনেরা ভেবে ভেবে হতে লাগলেন সারা।

পরবর্তী প্রভাতে, পাখীর কলরবের সাথে, অরুণ সম্পাতে, রাসবিহারীর জ্যেঠামহাশয় দেখলেন, তাঁহাদের হারানো ধন রাসবিহারী গৃহের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

তাঁর দেহ তখন ধূলি ম্লান। বসন-ভূষণ ছিন্ন। আননে মালিন্য!

রাসবিহারীর পক্ষে তখন প্রয়োজন বিশ্রাম, প্রয়োজন পরিচর্যা।

রাসবিহারীকে শয্যায় স্থাপন করা হল। বলিষ্ঠ রাসবিহারী দুর্বলের মতো শায়িত হয়ে পড়লেন। তাঁর দৃষ্টি তখন প্রায় নির্জীবতায় নিষ্প্রভ।

কিছুকাল পরে, রাসবিহারীর দেহ একটু সুস্থতা প্রাপ্ত হ'ল।

তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল ঃ রাত্রে কোথায় ছিলে?

তোমার পুস্তকাদি কোথায়?

রাসবিহারী নিরুত্তর।

ঐরূপ আরও নানা রকম প্রশ্ন পর পর জিজ্ঞাসা করা হ'ল।

কিন্তু রাসবিহারীর উত্তর কেউই পেল না।

রাসবিহারীকে কলিকাতা হতে চন্দননগরের ভবনে প্রেরণ করা হ'ল।

সেখানে অবস্থিত রাসবিহারীর পিতামহ মহাশয়ও রাসবিহারীর সেই রাত্রির অবস্থা এবং দুরবস্থা সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন করলেন।

কিন্তু কোন উত্তরই পেলেন না।

তখন সবাই ভাবলেন ছেলেটা কি বাক্যহারা হয়ে গেল? বোবা হয়ে গেল? কি ঘটনার ফলে এরূপ ঘটল?

রাসবিহারীর সেই রাত্রির অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নেরই উত্তর রাসবিহারী যখন কিছুতেই দিলেন না, তখন কেউ আর কিছু বললেন না।

সকলের প্রশ্ন থেমে গেল।

কিন্তু সেই সময় ছিলেন এমন একজন, যিনি পরের ছেলেকে করে ফেলেছিলেন আপন—আর সেই ছেলেকে দিয়েই যেন নিজের জীবন আপন করতে চেয়েছিলেন শোভন।

সেই তিনি হচ্ছেন রাসবিহারীর পরলোকগত মাতার ইহলৌকিক শূন্যস্থান পূর্ণকারিণী বিমাতা।

সকলে যা পারল না, রাসবিহারীর বিমাতা তা পারলেন। তাঁর স্নেহ ও মমতা রাসবিহারীকে এমন ক'রে তুলেছিল যে, বিমাতার নিকটে রাসবিহারী থাকতেন যেন তাঁর মাতার নিকটে।

একদিন রাসবিহারী তাঁর বিমাতার নিকটে ব'লে উঠলেন, মা, মা! আমি আর বিদ্যালয়ে পাঠ করব না।

বিমাতা বিস্মিতা হলেন। বিমাতা তাঁর সতীন পুত্রকে বোঝালেন, যে না পড়ে, সে সংসার পথে থাকে অন্যের পিছনে পড়ে। লেখা-পড়া মানুষের জীবনপথের দুই সাথী, ঠিক যেন চন্দ্র ও সূর্যের ভাতি—কিংবা যেন সিংহ আর হাতী।

লেখা-পড়া করে যেই,
জীবন রণে জয়ী সেই।

—বিমাতা ঐ হিতবাণী উচ্চারণ করলেন।

রাসবিহারী তখনই বলে উঠলেন, আমি রণ করতে চাই, করতে চাই রণ!—আমি হতে চাই একজন সৈন্য।—হ'লে সৈন্য, জীবন হবে ধন্য।

কিন্তু মা, এদেশের ইংরাজরাজ বাঙ্গালীকে গালি দেয়, সৈন্য করতে কিছুতেই চায় না।—বাঙ্গালী যদি সৈন্য হয়, তা হ'লে, এদেশে বিলাতের বর্বরতা আর টিকবে না,—সেটাই হচ্ছে বিলাতের বাবুদের ভয়।

মা, আমি গিয়েছিলাম একজন সৈন্য হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ

করবার জন্য। কিন্তু এদেশে ইংরাজের হীন স্বার্থ আমার সে প্রয়াশ ও প্রচেষ্টাকে করল ব্যর্থ।

তারা বলল, বাঙ্গালীকে সৈন্য করা হবে না। তখন তারা মনে মনে হয় তো বলল—তা হ'লে, এদেশে ইংরাজের রাজত্ব আর র'বে না।—বাঙ্গালী যদি ধরতে পায় প্রহরণ, তা হলে ইংরাজ আর এ দেশকে করতে পারবে না শাসন ও শোষণ।

মা, ওরা আমাকে সৈনিক হওয়ার সুযোগ তো দিলই না। অধিকন্তু, আমার হাতে প্রহরণ না দিয়ে, আমার পৃষ্ঠে প্রদান করল প্রহার। আমার বসন ভূষণ ক'রে দিল ছিন্নভিন্ন। আমাকে ফেলে দিল ধুলি-তলে। আমাকে ফিরে আসতে হ'ল অকারণ আঘাত পেয়ে মর্মস্থলে।

কিন্তু আমি একটা সৈনিক হবই হব। তখন ইতিহাস রচিত হবে অভিনব।

মা, আমি বাঙ্গালী ব'লে ওরা আমাকে সৈন্য হতে দিল না।

তখন আমি, নিজের নাম গোপন ক'রে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার চেষ্টা করলাম। তখন আমি ধরা পড়লাম। প্রহরণ প্রাপ্ত না হয়ে প্রাপ্ত হলাম প্রহার। কিন্তু তবু ভবিষ্যতে ভারত-মাতার স্বাধীনতার সৈন্য হওয়া চাই আমার! তা না হ'লে, বইব না আর এই জীবনের ভার!

দেখা যাচ্ছে, সেই অল্প বয়স্ক রাসবিহারী তখনই ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন, যে বন্দুকই হচ্ছে মানুষের পরম বন্ধু; আয়ুধ হচ্ছে ব্যক্তির পক্ষে, জাতীর পক্ষে এবং দেশের পক্ষে আয়ুদ। যে ব্যক্তি, অথবা, যে জাতি, উত্তমরূপে প্রহরণ প্রয়োগ করতে সমর্থ না হয়, সে অন্যের হস্তের প্রহার প্রাপ্ত হয়ে, পৃথিবীতে অধম হয়ে রয়; তার জীবন হয় দুঃখ দৈন্য-দুর্দশাময়।

স্বস্তিলাভ করতে গিয়ে শাস্তিলাভ

রাসবিহারী স্বস্তিলাভের পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বস্তিলাভের পথে এসে দেখা দিল শাস্তি!

রাসবিহারী কিছুতেই স্কুল গমন করতে চান না। তাই তাঁর পিতামহ তাঁকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করলেন। মুক্তমনা রাসবিহারীকে বাসভবনের ছাদের উপর বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা হ'ল।

রাসবিহারীর পায়ে পরিয়ে দেওয়া হল একটা মোটা শিকল, তার সঙ্গে রইল একটা বৃহৎ তালা। তার ফলে রাসবিহারী যেন হয়ে উঠলেন ঝালাপালা।

তবু তিনি মুসড়ে পড়লেন না। সেই বন্দী অবস্থাতেও আনন্দিত হয়েই রইলেন, সব কষ্ট সইলেন হাস্যমুখে, ভারতের বিদেশী শাসকের দাস্যস্বীকারের ভাবহীন বুকে।

সেই অস্বস্তির মধ্যেও, রাসবিহারী যেন স্বস্তিই লাভ করতে লাগলেন, এই রূপই দেখা গেল তাঁর মনোবল।

বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত রাম এই বিশ্বে অভিরাম। তিনি নয়নাভিরাম; তিনি হৃদয়াভিরাম; তিনি লোকাভিরাম।

সেই যে রাম, তাঁর জীবনে আরাম কখনও লাভ হয়নি,—আরাম তিনি কখনও চানও নি।

রাসবিহারী, হয় তো অজ্ঞাতসারেই, সেই সব সত্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এই বিশ্ববরেণ্য হওয়ার জন্যে, বড়ই দুর্গম পথের পথিক হওয়ার ভাবটি বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

অনেকেরই নিকট যাহা ভীষণ ঝড়, রাসবিহারীর ধীরদৃষ্টির সম্মুখে সেটা হয়েছিল যেন বর।

বিমাতার মধ্যে মাতা

অল্পবয়স্ক রাসবিহারীর ঐ বন্দীদশা যাঁকে বিশেষভাবে বেদনা প্রদান করেছিল, তিনি হচ্ছেন রাসবিহারীর বিমাতারূপী মাতা।

সেই অসীম মমতাময়ী যেন জানতেন না অন্যকিছু একমাত্র রাসবিহারী বই।

রাসবিহারীকে তিনি গণ্য করতেন তাঁর আত্মজ অপেক্ষা অধিক। সতীনপুত্র রাসবিহারী সততই ছিলেন সেই বিমাতার হৃদয়বিহারী। —এই চরাচরে সচরাচর যেমনটি দৃষ্ট হয় না। সেই বিমাতা মাতা ছিলেন তেমনটি।—তাঁর স্নেহ যথার্থই রচনা করেছিল রাসবিহারীর জন্য এক অনাময় গেহ।—তাঁর পরশ রাসবিহারীর পক্ষে যেন হয়েছিল অনুপম অমৃতরস।

একদিন, সেই নারী উপস্থিত হলেন তাঁর শ্বশুর কালীচরণের চরণ সমীপে। নিবেদন করলেন, আমি কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে যেতে চাই। তাই আপনার অনুমতি চাই।

কালীচরণ অস্বস্তি বোধ করলেন। প্রশ্ন করলেন তিনি, এখানে কি তোমার কোন প্রকার ক্লেশ হচ্ছে, মা?

রাসবিহারীর বিমাতা উত্তর করলেন, আমার রাসবিহারীকে আপনারা করে রেখেছেন বন্দী—এরূপ অবস্থায়, আমি কি ক'রে হতে পারি আনন্দী?—রাসবিহারীর বন্ধন কি আমারই বন্ধন নয়?

শ্বশুর কালীচরণ কোন কথা বললেন না। তিনি ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হলেন। বন্দী রাসবিহারীর অবস্থানস্থান অভিমুখে চললেন। তারপরে, রাসবিহারীর বন্ধন টুটল।

তখন রাসবিহারীর বিমাতার বদনে হাসি ফুটল।

রাসবিহারী দ্রুত বেগে এসে বিমাতার ক্রোড়ে স্নেহামৃত লুটল!

কালীচরণ সেই দৃশ্য দর্শনে, স্বর্গের যেন সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাঁর মর্ত্য জীবনে পুলক ঝলক তাঁর নয়ন ক'রে ফেলল অপলক।

যে সাধ করে উন্মাদ

বিমাতা মাতার মলিন মুখ রাসবিহারীর বুককে দিল দুঃখ। রাসবিহারী বললেন, মা, তুমি কিছু ভেবো না। আজ হতে আমি আবার বিদ্যালয়ে যাব।

রাসবিহারী তাঁর বাক্য অনুসারে কাজ করলেন—বিদ্যালয়ে যেতে আরম্ভ করলেন।

একদিন, কী ব্যাপার ?

একদিন, রাসবিহারীর বিমাতা তাঁদের টাকা-কড়ি রাখার বাক্স নিয়ে ব্যস্ত! রাসবিহারীও তখন রয়েছেন সেখানে, তাঁর সঙ্গে।

বাক্সটি ছিল না একদম ফাঁকা। বাক্সের ভিতরে ছিল কিছু টাকা। রাসবিহারীর সন্ধানীদৃষ্টি সেই টাকা-কড়ির উপর পতিত হল। রাসবিহারীর হৃদয়ে কিসের যেন একটা তরঙ্গ উত্থিত হ'ল।

কিছু কাল পরে, রাসবিহারীর বিমাতা মাতা লক্ষ্য করলেন, বাক্সের টাকাকড়ি বাক্সের ভিতরে নেই, আর তাঁর পুত্রটিও সেইখানে নেই। ব্যাপারটা বুঝে ফেলতে রাসবিহারীর বিমাতার মোটেই বিলম্ব হল না। তিনি বুঝতে পারলেন, রাসবিহারী সেখান থেকে চলে গেছে, বাক্সের টাকাকড়িও সেই সঙ্গেই চ'লে গেছে!

তারপরে, নানাস্থানে ছুটল নানা লোক রাসবিহারীর খোঁজে।

কিন্তু রাসবিহারী তখন নিখোঁজ।

রাসবিহারীর বিমাতা মাতা তাঁর নয়নের অশ্রু সাম্‌লে রাখতে পারলেন না।

রাসবিহারীর বিমাতার পরকে আপন করা প্রাণ হয়ে পড়ল ম্রিয়মান।

বিমাতা মাতা বুঝলেন, তাঁর রাসবিহারীর যে সাধ তাঁকে করে

ফেলেছেন প্রায় উন্মাদ, সে সাধ না মেটা পর্যন্ত, রাসবিহারী প্রস্তুত করতে তাঁর জীবনান্ত।

তিনি সৈনিক হতে চান—সেই তাঁর জীবনের গান—সেই তাঁর লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের সঙ্গেই তার সখ্য।

লক্ষ্য পথে তীরবৎ
ছুটেছে সে অবিরত।
বীরত্বের পথখানি
দেয় তারে হাতছানি!

স্বাধীনতার সাধ ও স্বাদ

এই বিশ্বে অনেকেই নিঃস্ব হয়ে আসে এবং নিঃস্ব জীবনযাপন ক'রেই অন্ধকারে চ'লে যায়।

রাসবিহারীও সংসারিক দিক্ দিয়ে প্রায় নিঃস্ব হয়েই সংসারে এসেছেন।

কিন্তু এই নিঃস্ব ভীষ্ম হয়ে উঠতে চায়, অল্পে সে তুষ্ট নয়। যে দেশের মানুষ বিদেশী শাসকের বিদ্বেষ বুদ্ধির ফলে ছিল নিরস্ত্র, সেই দেশের রাসবিহারী কেন ধারণ করতে চাইলেন অস্ত্র? কেন তিনি হতে চাইলেন সৈনিক?

তিনি সৈনিক হতে চাইলেন অন্তর্নিহিত কর্তব্যবোধের প্রেরণায়। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সাধনায়।

ব্যায়াম বলে বিপুল শক্তি সঞ্চিত ছিল রাসবিহারীর বপুস্থলে।

বাল্যকাল হতেই, সঙ্গীদের উপর তাঁর নায়কত্ব তাঁকে দান করেছিল শ্রেষ্ঠত্ব।

রাসবিহারীর মানসিক শক্তি, দৈহিক শক্তির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তাঁর মাতৃভুমি, ভারতভূমি যদি বিদেশীর

নিগড়ে আবদ্ধ হয়, তা হ'লে ভারত জননীর সন্তানদের জীবন হয়ে পড়ে শুধু বন—হয়ে পড়ে জঙ্গল,—কোথায় সেখানে মঙ্গল।

ঐ কারণে, রাসবিহারী সততই উৎসাহী ছিলেন প্রবেশ করতে সৈনিক জীবনে, ভারতবিদ্বেষী অরাতি উৎসাদনে।

নাই যে দেশের স্বাধীনতা,
সে দেশ তুচ্ছ দুর্বলতা!

—এই আত্মসম্মান-বোধ রাসবিহারীকে করে তুলতে চেয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বোধ।—তাই তথাকথিত শান্তিকে তিনি একটা ভ্রান্তি ব'লে গণ্য করেছিলেন। এবং সেইটা তিনি ভ্রান্তিহীন ভাবেই করেছিলেন।

যুদ্ধ নরে শুদ্ধ করে

যুদ্ধ মানুষকে শুদ্ধ করে, একথা অদ্ভুত ও অসম্ভব ব'লে মনে হতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে ঐ অভিমত অসার কি ?

যুক্তি-বিচারে দেখা যায়, ঐ অভিমত অসার নয়।

যুদ্ধ করার জন্য, এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য, মানুষের যতগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন হয়, অন্য কোন কর্মের জন্যই হয়তো, মানুষের ততগুলো গুণ থাকা প্রয়োজন হয় না।

উত্তমরূপে যুদ্ধ করার জন্য এবং যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযম, নির্ভীকতা, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, বাক্‌পটুতা, অস্ত্রচালন-দক্ষতা, সেবা, সহিষ্ণুতা, অস্ত্র নির্মাণ-দক্ষতা, একাগ্রতা এবং আরও বহু বহু কর্মভার মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন হয়।

যুদ্ধের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে পরাশর-সংহিতার বাণী এইরূপ :

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্যমণ্ডল ভেদকৌ।
পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥

যত যত্র হতঃ শূরঃ শত্রুভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অক্ষয়ান্ লভতে লোকান্ যদি ক্লীবং ন ভাষতে॥
জিতেন লভতে লক্ষ্মীং ·········
ক্ষণবিধ্বংসিকেঽমুস্মিন্ কা চিন্তা মরণে রণে॥
যস্তু ভগ্নেষু সৈন্যেষু বিদ্রবৎসু সমন্ততঃ।
পরিত্রাতা সদা গচ্ছেৎ স চ ক্রতু ফলং লভেৎ॥

* * * *

ললাট দেশাদ্রুধিরং হি যস্য
তপ্তস্য জন্তোঃ প্রবিশেচ্ছ বক্ত্রে,
তৎ সোমপানে ন হিতস্য তুল্য,
সংগ্রাম যজ্ঞে বিধিবচ্চ দৃষ্টম্॥
বং যজ্ঞসজ্ঞৈস্তপসা চ বিদ্যয়া,
স্বর্গৈষিণো পত্র যথৈব বিপ্রাঃ।
তথৈব যান্ত্যেব হি তত্র বীরাঃ,
প্রাণান্ সুযুদ্ধেন পরিত্যজন্তঃ॥

অর্থাৎ, যোগী পরিব্রাজক এবং সম্মুখ সমরে নিহত ব্যক্তি সৌরমণ্ডল ভেদ ক'রে ঊর্ধ্বলোকগামী হয়ে থাকেন। বীর ব্যক্তি অরাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, যে স্থানেই নিহত হোন না কেন, তার মৃত্যু সময়ে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তা হ'লে তিনি অক্ষয় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন। যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত হ'লে, সে যোদ্ধার লক্ষ্মী-লাভ হয়। এই দেহ অল্পকাল স্থায়ী। সুতরাং এর জন্য আর রণে বা মরণে চিন্তা কি! যুদ্ধস্থলে সৈনিকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পলায়নপর হলে, যে ব্যক্তি সেই সময়ে তাঁদের রক্ষা করেন, তিনি, যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ফল প্রাপ্ত হন।······

শত্রুশরবিদ্ধ বীর ব্যক্তির ললাট হতে নির্গত রক্তধারা যদি তার মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তা হ'লে, সেইটি যুদ্ধরূপ-যজ্ঞে তাঁর সোমরস পানের মতো হয়ে থাকে,—এটা বিধি অনুসারেই দেখা গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ যজ্ঞ, তপস্যা এবং বিদ্যাদ্বারা স্বর্গপ্রার্থী হয়ে যে স্থানে গমন করেন, বীর পুরুষেরা ধর্মানুমোদিত যুদ্ধে জীবন বিসর্জন করে, সেই স্থানেই গমন ক'রে থাকেন।

ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ নিন্দনীয় নয়, বর্জনীয় নয়। —প্রকৃত পক্ষে একটু বিচার ক'রে দেখলেই, দেখা যাবে, জীবের জীবনের সম্পূর্ণ সময়টাই যুদ্ধময়।—জীবকে মৃত্যুগ্রস্ত করার জন্য শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, রোগ, ক্ষুধা, অভাব এবং আরও বহুপ্রকার ব্যাপার আছে। মানুষকে সেইসব ব্যাপারের বিরুদ্ধতা ক'রে—সেই সব ব্যাপারে বাধা দিয়ে, সেগুলোকে তুচ্ছ গাধা বানিয়ে দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।—সুতরাং যুদ্ধ কি শুদ্ধিকর কার্য নয়?—

—এতসব বলবার কারণ এই যে, রাসবিহারী যা করতে চেয়েছেন এবং করেছেন, সেটা গতানুগতিক কিছু নয়, অন্য দশজনের মতো কোন কর্ম নয়।—কাজেই রাসবিহারীর অনুষ্ঠিত কর্মের ঔচিত্য সম্বন্ধে এত সব অনুকূল আলোচনার প্রয়োজন হয়।

রাসবিহারী বসু ভারতের পশ্চিম অঞ্চলের অনেকগুলো সৈন্যকেন্দ্রে পর্যটন করলেন, সর্বত্রই চেষ্টা করলেন সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করবার জন্য। কিন্তু সর্বত্রই শুনলেন: না, না, না! তোমাকে সৈন্যদলে ভর্তি করা হবে না।—যে আয়ুধ আয়ুদ, সে আয়ুধ তোমার হাতে দেওয়া যেতে পারে না।—তা হলে, বিদেশীর মসনদ এ দেশে আর থাকতে পারে না।

রাসবিহারীর সঙ্গে যে সামান্য অর্থ ছিল, তা এত দিনে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এইবার অর্থাভাব তার মনের মহাভাবটিকে মাটি করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

কিন্তু রাসবিহারী যে খাঁটি।—তাঁর মহাভাব কি কখনও হয়ে যেতে পারে মাটি!

—তাঁর সমগ্র জীবন একটা ধ্যানের পৌরুষ,—সেটা নয় ধানের তুচ্ছ তুষ।

পিতা বিনোদবিহারীর নিকট পুত্র রাসবিহারীর সংবাদ পৌঁছে গেল। কিন্তু সে সন্দেশ, সন্দেশ নয়; সে সন্দেশ পিতার পক্ষে দুঃখময়।

বিনোদবিহারী রাসবিহারীর নিকটে অর্থ প্রেরণ করলেন। সে অর্থ রাসবিহারীকে চন্দননগর ভবনে উপনীত হতে সমর্থ করল।

রাসবিহারীর স্বজনগণের চক্ষে রাসবিহারীর অবস্থা তখন একটা দুরবস্থা।

রাসবিহারী আর বিদ্যালয়ে গমন করলেন না—নিজের জীবনকেই তিনি একটি বিদ্যালয় করে তুলতে সচেষ্ট হলেন।

নব নব ও অভিনব

সাধারণত, লোকে পুঁথিগত বিদ্যাকেই বড় বিদ্যা ব'লে মনে করে; কলমকেই বলম্ বা বল ব'লে গণ্য করে—লেখনীকেই জীবনের সুখপ্রদ স্বর্ণখনি ব'লে মনে করে।

কিন্তু সাহসী অসির তুলনায়—দুঃসাহসী অসির তুলনায়—কলমের শক্তি আর কতটুকু।

রাসবিহারী অসির পথ অন্বেষণ করতে লাগলেন। তিনি, তাঁর প্রগাঢ় চিন্তার ফলে বুঝতে পারলেন, তরবারই হচ্ছে সংসার-সমুদ্র তরবার উত্তম তরণী। তাই তিনি অসির পথ—বা সাহসীর পথ ধরলেন।

বিশেষতঃ, পরাধীন ভারতের পক্ষে যে তরবার পথ আর নেই, ভারত ভাবুক রাসবিহারী সেটি ভালভাবেই অনুভব করলেন।

রাসবিহারী সমর-সম্বন্ধীয় বহু পুস্তক অধ্যয়ন করলেন।—সমর

যে জাতিকে অমর করে, রাসবিহারীর অন্তরে সেই ভাবটি বিকশিত হল।—যে জাতি সমরে পরাঙ্মুখ, মরজগতের সুখ তার প্রতি বিমুখ, —মানুষের ইতিহাস থেকে এই সত্যটি সংগ্রহ করলেন রাসবিহারী।

"অরিরে যে মারে,—কিংবা,
যে মরে সমরে,
এই মর্ত্যে সে অমর,—
কে তার সম রে!"

—অমৃত-কবির এই অমৃত-বাণী রাসবিহারীর চিন্ময় চিত্ত-বিহার করতে লাগল।

রাসবিহারীর জীবন-উদ্যানে কেবলমাত্র ঐ একটি মাত্র ভাব-পুষ্পই বিকশিত হ'ল না। বহু ভাব পুষ্প-পুঞ্জে তাঁর জীবন যেন পরিণত হ'তে লাগল কুঞ্জে।

রাসবিহারী ইতিমধ্যে, তাঁর পিতা বিনোদবিহারীর সঙ্গে সিমলায় আগমন করেছেন।

সিমলায় তিনি তখনকার সরকারী মুদ্রণালয়ে কর্মী নিযুক্ত হলেন—কপি হোল্ডারের কার্য প্রাপ্ত হলেন।

কিন্তু কেবলমাত্র ঐ কর্ম রাসবিহারীর মর্ম নর্মময় করে রাখল না। তিনি নব নব কর্মে—জীবনের নব নব ধর্মে—দীক্ষিত ও শিক্ষিত হতে চাইলেন।

রাসবিহারী টাইপের কাজ শিক্ষা করলেন। তাঁর সে শিক্ষা এমন শিক্ষা, যে, নেত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত ক'রে দেওয়া হলেও, তাঁর নেত্রদৃষ্টি যেন আচ্ছাদন ভেদ ক'রেও সক্রিয় হত!—তিনি নির্ভুল টাইপের কাজ সম্পাদনে সমর্থ হতেন।

রাসবিহারী ইংরাজী ভাষা বেশ খাসাভাবেই আয়ত্ত করতে লাগলেন। ইংরাজী ভাষার স্রোতে তিনি যেন অনায়াসেই ভেসে যেতে লাগলেন।

বিদেশী ভাষার বানান-বন্যা, তাৎপর্য-তরঙ্গ, বাক্য গঠন কাঠিন্যের

ক্রব্যাদ রাসবিহারীর ঐ ভাষা আয়ত্ত করবার সাধ বিনষ্ট ক'রে ফেলতে পারল না।

রাসবিহারী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জীবনবৃক্ষে কতই না প্রশাখা! তাঁর জীবন-ইন্দ্রধনুতে কতই না বর্ণ সমাবেশ!

রাসবিহারী তাঁর জীবন-নাট্যে একটি মাত্র ভূমিকা অবলম্বন ক'রে সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন না।—

রাসবিহারী সিমলায় নাট্য-কলা সংঘের সদস্য হলেন। অভী-পুরুষ রাসবিহারী অভিনয়েতেও অভিনব দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি "চন্দ্রশেখর" নাটকে লরেন্স ফস্টরের ভূমিকা অবলম্বন করলেন। তাঁর সেই ভূমিকা তাঁকে প্রশংসার অধিকারী ক'রে তুলল।

তিনি সিমলার সকলের নিকটই সুপরিচিত হয়ে পড়লেন।

শ্রীধর্মদাসবাবু এবং শ্রীললিতবাবু ছিলেন সিমলায় নাট্যক্ষেত্রে কলা-কুশলী। রাসবিহারীর নাট-প্রতিভা তাঁদের প্রশংসা-ভূষিত হ'ল। রাসবিহারী যদি নাট্যক্ষেত্রেই অভিনিবিষ্ট থাকেন, তা হ'লে, নাট্যক্ষেত্রে একদা তিনি হবেন অদ্বিতীয়,—এরূপ অভিমত ঐ দুই গুণী ব্যক্তি একাধিক বার প্রকাশিত করেছেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে তাঁরা রাসবিহারীর তুলনাও করেছেন। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও রাসবিহারীর অভিনয় দর্শনে 'বলিহারি'! 'বলিহারি' ব'লে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের লেখনী স্বর্ণখনি অদ্ভুত "মেঘনাদ বধ" কাব্যকে বলা যায় কাব্য রত্নাকর। রাসবিহারী সেই কাব্যখানির নাট্যরূপ রচনা করলেন সিমলার নাট্যক্ষেত্রে অভিনয় করবার জন্য। সেই পাণ্ডুলিপিখানি রাসবিহারীদের চন্দননগর ভবনে বেশ কিছুদিন ছিল। তারপরে, তখনকার বিদেশী সরকারের অনুচর সেই পাণ্ডুলিপি হস্তগত করে। চন্দননগর ভবনে খানাতল্লাসীর সময়ে তাদের সেই দুষ্কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ভারত-বিদ্বেষী বিদেশী এবং

তাদের এখানকার স্বদেশী অনুচরেরা নানাপ্রকারে এই দেশের, এই জাতির, এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং আরও অনেক কিছুর কতই না অনিষ্ট করেছে !

কেবলমাত্র নাট্যকলা নিকেতনেই রাসবিহারীর সাধনা সীমাবদ্ধ ছিল না।

এমন যে কঠোর সাধনাসাধ্য সংগীত কলা, সেও যেন হয়ে মালা, রাসবিহারীকে করেছিল আলা !

রাসবিহারী সিমলার সংগীত-সংঘে যোগদান করলেন। সংগীত রাসবিহারীকে যেন দিতে লাগল ইষ্টের ইঙ্গিত।

রাসবিহারী সংগীতের নানা বিভাগে দৃষ্ট হতে লাগলেন সকলের পুরোভাগে। তাঁর কণ্ঠস্বর সকলের সম্মুখে যেন হয়ে উঠল আনন্দের কলনির্ঝর। তাল ও লয় রচনা করতে লাগল যেন আনন্দ নিলয়।

রাসবিহারী তাঁর কলকণ্ঠের ধ্রুপদ গানে ভূষিত হতে লাগলেন বিপুল সম্মানে।

নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারেও রাসবিহারী কৃতিত্বের কৌলীন্য লাভ করতে লাগলেন। বাদ্যযন্ত্র যেন রাসবিহারীর মন্ত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। বেহালা বাদ্যযন্ত্রটি যেন হয়ে পড়ল রাসবিহারীর বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত।

কে ছিলেন রাসবিহারীর সংগীতশিক্ষার আচার্য ?

রাসবিহারীকে সংগীত শিক্ষাদানের আচার্য ছিলেন ললিত কলাকোবিদ শ্রীললিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ললিতের কণ্ঠও ছিল ললিত। নামের ও গুণের সমন্বয় ঘটেছিল সেই গুণীজনের মধ্যে।

কে ছিলেন রাসবিহারীকে বাদ্যযন্ত্র বাদনে অনবদ্য ক'রে তুলবার আচার্য ? সেই আচার্য ছিলেন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু।

বিপিন যেরূপ বিহগ কাকলীময়, বিহঙ্গ রঙ্গ-নৃত্যময়, সেই শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিনও ছিলেন সেইরূপ বীণা বেহালা বাদিত্রবিদ্যাময়।

সরস্বতীর পদপ্রসাদ সমৃদ্ধ পদ্মে কতই তো দল বা পাপড়ি। এক

একটি পাপড়ির এক একটি গুণ, তাই নয় কি? মধুকর সতী সরস্বতীর সেই পদপ্রসাদ সমৃদ্ধ পদ্মের প্রত্যেকটি পাপড়িতে মধুপান না ক'রে কি নিরস্ত থাকে?

রাসবিহারীও দেবী সরস্বতীর পদোদ্যানে নানাবিধ পুষ্পের মধু আহরণে অধ্যবসায়শীল রইলেন।

রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী কেবল মাত্র তাঁর চাকরি ক্ষেত্রের খাতায় তাঁর লেখনী লীলা প্রদর্শন করতেন না। তিনি প্রবন্ধ রচনা করতেন পত্রিকায়—যে সব প্রকাশ করতেন। তাঁর কেরাণী কর্মের অবসর সময়ে, তিনি ভারতীর ভাতিক্ষেত্রে ক্রীড়া করতেন।

যারা বলে, একটা কর্ম তো বাধ্য হয়েই করতে হয়, অন্য উত্তম কর্ম সম্পাদনের আর সময় কোথায় পাই? তারা তাদের জীবনকে গণ্য করে যেন একটা 'পাই' বা পয়সা। কিন্তু যারা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে অবিরত পরিশ্রম করে, তাদের মধ্যেও দেখা যায়, কেহ কেহ অন্য উত্তম কর্ম সম্পাদনের জন্য সময় পায়। সেইরূপ কর্মীর সেই জীবন 'পাই' হয় না, হয় পরম কোনও কিছু, যা তার জীবনকে নীচু হ'তে ক'রে তোলে উঁচু।

বিনোদ-নন্দন রাসবিহারীও প্রবন্ধ রচনায় প্রকৃষ্টরূপে মনোযোগী হলেন। সেই সকল প্রবন্ধ বাসভবন কক্ষের বাইরে নানারূপ পত্রিকা প্রাঙ্গনে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিনা, তা এখন হয় তো ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু রাসবিহারীর অন্তরঙ্গীরা ও সঙ্গীরা আস্বাদন করেছিলেন সেই সব রচনা। তাঁদের রসনা কখনো হয়েছিল প্রশংসা রস-পরিবেশক, কখনও হয়েছিল সমালোচনাবর্ষী সায়ক। কিন্তু সেই সব রচনা যে কুশলী লেখনীর প্রচেষ্টার নিদর্শন, এ অভিমত সকলেই করেছেন সমর্থন।

সেই রচনার সাধনায়, একজন ছিলেন রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ।

তিনি ছিলেন রাসবিহারীর সহকর্মী, হয় তো সমমর্মীও। তিনি হচ্ছেন, তখনকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের প্রসিদ্ধ কর্মী শ্রীযুক্ত কে. সি. রায়।

ভারতের তখনকার সরকার ছিল বিদেশী। সেই সরকার ছিল ভারতের সর্বপ্রকার স্বদেশী ভাব বিদ্বেষী।

সেই সরকারের কতকগুলো গোপনীয় বিষয় ছিল। এদেশীয় লোকে সেই সব অবগত হলে, ভারত বিদ্বেষী সেই বিদেশী সরকারের এদেশের প্রতি অনিষ্ঠকর্ম ব্যাহত হত।

সেই বিদ্বেশী সরকারের কতকগুলো গোপনীয় কাগজপত্র তখন সরকারী মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হচ্ছিল।

একদিন প্রভাতে পরিদৃষ্ট হ'ল, সেই গোপনীয় বিষয় আর গুপ্ত নেই—সেগুলো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নাচছে যেন ধেই ধেই!—সেগুলো হয়ে গেছে ফাঁস; তার ফলে শিথিল হয়ে পড়তে পারে এদেশীয়দের জন্য তৈরী বিদেশী সরকারের নাগপাশ।

বিদেশী সরকার স্থির করল, তাদের গুপ্ত বিষয় এদেশের যে ব্যক্তি করেছে প্রচার, একটা আছাড় মেরে সেই বাছার প্রাণ সংহার করা দরকার এইবার!

এদেশের পক্ষে সেই ব্যক্তি সুকৃতিকারী;—আর সেই বিদেশীর পক্ষে, সেই ব্যক্তি দুষ্কৃতকারী। সেই ব্যক্তিকে আবিষ্কার করার জন্য বিদ্বেষ্টা সরকারী প্রচেষ্টা প্রচণ্ড রকমেই চলল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হ'ল না, হ'ল নিষ্ফল।

কিন্তু কে সে কাজ করেছে, একজনে বুঝলেন তা নিজের মনে মনে। যিনি বুঝলেন, তিনি কে?

তিনি রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী, তিনি বুঝলেন তাঁর পুত্র এবং সেই পুত্রের বন্ধু গোপনীয় সরকারী সংবাদ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ঐ কারণে এবং সংশ্লিষ্ট নানা কারণে, বিনোদবিহারীর ক্রোধাগ্নি

প্রজ্বলিত হল! পুত্র রাসবিহারী তাঁর পিতার মুখ হতে শ্রবণ করলেন কঠোর কথা: তুমি চাকরী ছেড়ে দাও! তা না হলে, আমাকেই চাকরি ছাড়তে হবে।

রাসবিহারী সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করলেন।

মাতৃভূমি ভারতের ভালো করতে গিয়ে ভারতের ভাতের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে, বকধার্মিক না হয়ে, স্বদেশের সেবক হতে গিয়ে, স্বার্থের দিকে আর্তদৃষ্টি নিক্ষেপ না ক'রে, পরার্থকেই পার্থিব জীবনের পরমপ্রাপ্তি ব'লে গণ্য করতে গিয়ে, রাসবিহারী তখন যা করেছিলেন তার ফলে, তাঁর লাভ হয়েছিল তিরস্কার। কিন্তু সেই তিরস্কারই হয় তো হয়েছিল পুরস্কার।

শূন্য আবাস করছে হা-হুতাশ

এদেশে তখন বিদেশীর স্বার্থ এই দেশকে নানা দিক দিয়ে ক'রে ফেলেছে আর্ত।

পিতা-পুত্রে, মাতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, পতি-পত্নীতে, প্রতিবেশী-প্রতিবেশীতে হয়েছে বিবাদ; তার ফলে, সঞ্চার হয়েছে বিষাদ; একমাত্র ঐ বিদ্বেষী বিদেশীর কূটকৌশলের ফলেই।

রাসবিহারী তো তখন তাঁর চাকরির অফিসশালা ত্যাগ করলেন। কিন্তু তিনি স্বগৃহে বসে রইলেন কি?

ব'সে থাকবার লোক তিনি ছিলেন না; বশে থাকবার লোকও তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন সদা শৌর্যশীল।

একদিন, রাসবিহারীর পিতা-মাতা দেখলেন, তাঁদের পুত্র যে প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতেন, সেই প্রকোষ্ঠ শূন্য। সেই শূন্য আবাস যেন রাসবিহারী বিহনে করছে হা হুতাশ!

রাসবিহারী তখন কোথায়?

স্বাধীনতার সাধনা অবাধে অগ্রসর হতে পারে যেথায়, হয় তো তিনি তখন সেথায়।

রাসবিহারী নিরুদ্দিষ্ট হলেন ; কিন্তু উদ্দেশ্যহীন নিশ্চয় হলেন না।

রাসবিহারীর বিমাতা বিমর্ষ হলেন, বিমনা হলেন, বিষাদগ্রস্তা হলেন, ব্যাকুলা হলেন। তাঁর যে পুত্র তাঁর গর্ভজাত নয় তাঁর সে পুত্র যে তাঁর গর্বের বিষয় !—সেই পরের পুত্র যে তাঁর আপন পুত্র, এমনই নিবিড় হয়ে গেছে বিমাতা ও সতীন পুত্রের অচ্ছেদ্য স্নেহসূত্র।

রক্তের বন্ধন, ও অনুরক্তির বন্ধন,—এতদুভয়ের মধ্যে, শেষোক্ত বন্ধন দৃঢ়তর নয় কি ?

রাসবিহারীর মাতা, পরলোক গমনকালে, রাসবিহারীর জন্য তাঁর যে স্নেহরাশি সে স্নেহরাশি সঙ্গে নিয়ে যাননি—ইহলোকেই রেখে গিয়েছেন। রাসবিহারীর বিমাতা, স্বামীগৃহে আগমন ক'রে, তার সেই সতীনের পুত্র-স্নেহের উত্তরাধিকারিণী হয়ে, সেই স্নেহরাশি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। তাই সেই স্নেহরাশি অটুটই ছিল, এক আধার হতে অন্য আধারে।

পত্র যেন অমৃত সত্র

রাসবিহারী কোথায় গেলেন, কেমন আছেন, কি করছেন,—রাসবিহারী পিতা-মাতার চিত্ত তখন সেই চিন্তায় ম্রিয়মান।

তাঁরা নানাজনকে জিজ্ঞাসা করেন ; নানা সূত্রে সন্ধান করেন, নানাস্থানে সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই পরম সন্দেশ প্রাপ্ত হন না। তাঁদের হৃদয়-দেশ আকুল ও ব্যাকুল হয় মাত্র।

সহসা একদিন দেখা গেল, ডাকবিভাগের এক কর্মী রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারীর আবাস ভবনের দ্বারে এলেন। তাঁর হাতে একখানি পত্র।

বিনোদবিহারী সেই পত্র দর্শনে, তাঁর দুঃখ সাগরের যেন একটা কূল পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ক'রে সেই ডাককর্মীর হাতের পত্রখানি নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন।

সেই পত্রে অতি অল্প কয়েকটি মাত্র ছত্রই রয়েছে। কিন্তু, পত্র পাঠান্তে, বিনোদবিহারীর তখনকার মরু-প্রাণ প্রান্তে যেন পুষ্প বিকশিত হয়ে উঠল।

বিনোদবিহারীর মনে হল—সেই পত্র যেন পত্র নয়, সেই পত্র যেন এক সত্র অমৃত সত্র!

বিনোদবিহারী পত্র হস্তে অতি ব্যস্তে ছুটলেন গৃহাভ্যন্তরে, উত্তাল আনন্দ উর্মি উপভোগ করতে করতে স্বীয় অন্তরে। তিনি পত্নীকে পত্রখানি প্রদর্শন করলেন। রাসবিহারীর বিমাতা, সেই পত্র দর্শন ক'রে, মগ্ন হলেন যেন অমৃত সাগরে!

রাসবিহারী সেই পত্রে লিখেছেন, পিতা, আমি ভাল আছি। নিশ্চয় আছি তোমার স্নেহময় বক্ষের কাছাকাছি। মাকে কহিও, তাঁর এই সন্তানের মন ও প্রাণ যেন তাঁর পদপ্রান্তে পায় স্থান! তাঁর মাতৃঅঙ্ক - সেই তো এই জীবন-শর্বরীর শশাঙ্ক!—তাঁর মাতৃ-ক্রোড়—সেই তো এই নিস্বের পক্ষে কড়ি ক্রোড় ক্রোড়!—তাঁর স্নেহ—সেই তো তাঁর এই সন্তানের শাশ্বত গেহ। সেই তো আমার ইহজীবনের সঞ্জীবনী অবলেহ!

মাতা ও পিতা পুত্রের পত্র পেলেন বটে। কিন্তু রাসবিহারী যে তখন কোথায়, কি অবস্থায়,—তার উল্লেখ সেই পত্রে নেই।

তবু সেই পত্রই মাতৃ-পিতৃ প্রাণে প্রদান করান প্রচুর সান্ত্বনা! একদা পুত্রের দর্শন পাওয়া যাবে, তাঁদের চিত্তদেশে সদা জাগ্রত রইল এই বাসনা।

যেন আকস্মিক আলোর ঝিলিক

অনেক কাল পরের একটা ঘটনা। ঘটনাটা ঘটাময় নয় তবু যেন ঘটাময়!

রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী এক দিন কনকা-সিমলা রেলপথের এক ট্রেনে উপবিষ্ট। কি যেন ভাবাবিষ্ট। তাঁর পুত্র তখন নিরুদ্দিষ্ট। সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত তখন হয়তো ক্লিষ্ট।

ট্রেন যখন কোন স্টেসনে এসে দাঁড়ায়, তখন বিনোদবিহারীর সন্ধানী নেত্র বাতায়ান দিয়ে বাইরের দিকে চায়; হঠাৎ পুত্রের দর্শন লাভ করতে চায়।

কিন্তু তাঁর পুত্র তখন কোথায়?

একটা রেলস্টেশনে গাড়ী এসে থামল। কিছু সংখ্যক লোক উঠল, কিছু সংখ্যক লোক নামল।

বিনোদবিহারী যে প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ একটি যুবক সেইখানে প্রবিষ্ট হ'ল। বিনোদবিহারী দেখলেন, সেই যুবক বাঙ্গালী নয়, পাঞ্জাবী।

বিনোদবিহারী অন্য দিকে দৃষ্টি দান করলেন।

একটু পরে তিনি দেখলেন, সেই যুবকের আস্যে মৃদু মৃদু হাস্য কিসের আনন্দে করছে যেন লাস্য।

বিনোদবিহারী হয়তো সেই যুবকের সেই হাস্যের ভাষ্য করতে চেষ্টা করলেন নিজের মনে মনে।

কিন্তু, কিছুই স্থির করতে না পেরে, যেন একটু অস্থির হয়ে ব'লে উঠলেন, মহাশয়ের কি আশয়? আপনি কি আমাকে চেনেন?

যুবক মুখে কিছু বলল না, বুকে হয় তো কিছু বলল। সে বিনোদবিহারীর চরণ বরণ করল।

এতক্ষণে, বিনোদবিহারীর স্বপ্ন যেন ভঙ্গ হ'ল। তিনি, যেন

অকূলে কূল পাওয়ার মতে হয়ে ব'লে উঠলেন, ওরে, তুই কি আমার রাস্থ ?—আমার রাস্থ ?

—বলতে বলতে, বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর আত্মজকে। তাঁর নয়ন অশ্রু সম্বরণ করতে পারল না।

তখন পিতা ও তাঁর অপত্য, উভয়ে লাভ করল যেন জীবনের পরমপথ্য, তাঁদের কাছে এই মর্ত্য হয়ে উঠল যেন অমর্ত্য।

রাসবিহারী কোথায় আছেন, কি কাজ করছেন, রাসবিহারীর নিকট হতে তাঁর পিতা কিছুতেই তা অবগত হতে পারলেন না। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। বললেন, তোর মাতা তোর বিহনে আর্তা। তাঁকে একবার দেখা দিবি না ?

রাসবিহারী স্বীকার করলেন, তিনি শীঘ্রই তাঁর মাতার চরণরেণু ধারণ করবেন।

ট্রেন রেলস্টেশন ত্যাগ করল। রাসবিহারীও ট্রেন ত্যাগ করলেন।

বিনোদবিহারীর দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ রইল।

ঘটনাটা ঘটল, যেন অন্ধকারের মধ্যে সহসা আলোর ঝিলিক।

কয়েকটি মাস অতিবাহিত হ'ল।

একদিন, প্রবল শীতের রাত, চারিদিকে প্রবাহিত হচ্ছে প্রচণ্ড তুষার ঝঞ্ঝাবাত। পৃথিবীটাকে যেন করতে চাইছে নিপাত !

সহসা, বিনোদবিহারীর ভবনের দ্বারে করাঘাত। সেই সঙ্গে-সঙ্গেই, আকূল আহ্বান ঃ মা, মা! দ্বার খোলো আমি—তোমার রাস্থ !

রাসবিহারীর বিমাতা তখন অসুস্থ। কিন্তু ঐ আহ্বানে মুহূর্ত-মধ্যে তাঁকে যেন করে ফেলল সুস্থ।—পুত্রের অদর্শনে, যে মাতৃহৃদয় ছিল দুঃস্থ সে হৃদয় হয়ে উঠল সুস্থ !

তারপর, পুত্র স্থান পেল তাঁর মাতৃপদতলে ; মাতা পেলেন তাঁর পুত্রকে বক্ষতলে। উভয়ের সকল কথা বলা হতে লাগল অশ্রুজলে !

রাসবিহারী তখন ছিলেন কসৌলী শহরস্থ পাস্তুর সংস্থার কর্মী। ঐ কর্মে রাসবিহারী অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন না।

দেরাদুনে বনবিভাগের যে কর্মকেন্দ্র অবস্থিত ছিল, রাসবিহারী সেইস্থানে করণিকের কর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

দেরাদুনে তখন একজন বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি তখন বৃদ্ধ। তিনি ছিলেন স্বদেশী ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ; তাঁর সংস্পর্শে যে ব্যক্তিই আসত, সেই ব্যক্তিরই চিত্ত যেন অনন্য সাধারণ গৌরব লাভ করবার জন্য নাচত।

রাসবিহারীর চিত্ত যাতে একাগ্র হয়, বহুদিক সঞ্চারী মন যাতে একদিকের অভিমুখী হয়, তার ফলে জীবন যাতে সুখী হয়, ভাব সমৃদ্ধ সেইটি করবার চেষ্টা করেছিলেন।

এদেশে বিদেশী ভাষা শিক্ষার দিকে যতখানি আগ্রহ ও উৎসাহ পরিদৃষ্ট হয়, স্বদেশী ভাষা শিক্ষা করবার জন্য, হয়তো ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সুচির স্মরণীয় সেই প্রাজ্ঞ প্রবর বৃদ্ধ ব্যক্তি তরুণ রাসবিহারীকে ভারতের নানা ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।

রাসবিহারীর জীবনের ঐ যুগে তাঁর দ্বারা ছোট ছোট বহু নিবন্ধ বিরচিত হয়। সেইসব একাধিক দৈনিক সংবাদ পত্রে মুদ্রিতও হয়।

অস্ত্র-আইন সম্বন্ধে রাসবিহারীর বিরচিত নিবন্ধ বিদেশীদেরও কৌতূহল সঞ্চার করেছিল।

যার মন সদা সন্ধানী, তার জীবন হয়ে উঠতে পারে যেন এক রাজধানী। বৃহৎ ব্যক্তিদের জীবনে ঐটির দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়।

রাসবিহারীর মনও হয়তো নব নব ও অভিনব কোন কিছু করবার জন্য সতত উদ্যমশীল ছিল। তাই তাঁর চিন্তা ও চেষ্টাও ছিল মানবজীবনের একাধিক ক্ষেত্রে বিচরণশীল। তিনি ছিলেন বহু কর্মের কর্মী। কিন্তু তাঁর জীবনের সর্বোপরি অধ্যবসায় ছিল ভারতের ভাস্বরতা সম্পাদনে।

বিপ্লবী বীর রাসবিহারী কি একদা, বাধ্য না হলেও, স্বেচ্ছায় বিড়ি তৈরী করার কর্ম করেছিলেন ?

মানুষের পক্ষে যে কর্ম প্রয়োজনীয়, সে কর্ম সামান্য হলেও, সামান্য নয়—রাসবিহারীর জীবনে তার দৃষ্টান্ত এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়।

তখন খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। বঙ্গে তখন স্বদেশী ও স্বাধীনতার জাগরণী যাগ। চারিদিকে শুধু ধ্বনি ঃ

জাগ, জাগ, জাগ।
দেশের সেবার লাগ!

রাসবিহারী ঐ সময়ে চন্দননগরে আগমন করলেন।

একদিন সকলে দেখল, রাসবিহারী কলিকাতা থেকে ফিরে এলেন। তাঁর সঙ্গে এল বিড়ি তৈরী করার জিনিসপত্র, কিছু তূলা, আর এল কয়েকটি চরকা।

বাড়ীর মধ্যে যেন একটা হই চই প'ড়ে গেল।

রাসবিহারীর পিতামহীর মুখে প্রশ্ন, মাতার মুখে প্রশ্ন ঃ এই সব কি কাণ্ড! তোর মাথা কি স্থির নেই ?

স্থির করেছি, বিড়ি বানাব, সূতা কাটব।—উত্তর করলেন রাসবিহারী।

সেই উত্তর অপর পক্ষকে ক'রে ফেলল যেন নিরুত্তর।

বিড়ি বরেণ্য বস্তু না হলেও, ব্যবসার ক্ষেত্রে এদেশে বিদেশী সিগারেটের বাজারকে বীরের মতোই বাধা দিয়েছে।—সে ক্ষেত্রে বিড়ি বীরের কর্মই করেছে।

চরকা যন্ত্র না হলেও, এদেশে, শিল্পক্ষেত্রে বিলাতী বস্ত্রের শোষণকে চড় মেরেছে, শাসন করেছে।

রাসবিহারী, স্বদেশী ভাবে ভরপুর হয়েই বিড়ি ও চরকায় মনোযোগ দিয়েছিলেন।

রাসবিহারী, বহুকাল যাবৎ বিড়ি তৈরী করেছিলেন ; চরকায় সূতা কেটে ছিলেন।

ঐ ক্ষেত্রে, অনেকের উপহাস রাসবিহারীর আদর্শপ্রভাবে হয়ে গিয়েছিল যেন তুচ্ছ পাতিহাঁস !

বিপ্লবের বল-বর্ত্মে

তখনকার বিষাদ-বিষদিগ্ধ পরাধীন ভারত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একদা জাগ্রত হয়ে উঠল।

এই অগ্নি-উপাসনার দেশে, স্বাধীনতা লাভের জন্য অগ্নির পথ অবলম্বন করা হ'ল। ভারতের স্বাধীনতার সাধক ভারতপুত্রদের হস্তে বোমা ইত্যাদি সক্রিয় হয়ে উঠল।

খৃষ্টীয় ১৯০৭ সাল, ডিসেম্বর মাস—বাঙ্গালার তখনকার বিদেশী রাজপ্রতিনিধির বিশেষ ট্রেন নারায়ণগড়ের নিকটে পথচ্যুত ক'রে ধ্বংস ক'রে ফেলবার চেষ্টা করা হয়। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গোয়েন্দা এলেন-এর উপর বোমা বর্ষণ। ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে—বঙ্গের বিদেশী কর্তার ট্রেন চন্দন নগরের নিকটে চুরমার ক'রে ফেলবার চেষ্টা হল। প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

কুষ্ঠিয়ার ঘটনা। হিগিন বথামকে গুলি করে গোল্লায় গমন করানোর উদ্যম। লক্ষ্য লাভে ব্যর্থতা।

১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে—তখনকার ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের মেয়রের প্রতি বোমা নিক্ষেপ। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

বিহারের মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড নামক এক ইংরাজের নিধন উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ। বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল একটা গাড়ীর উপর। সেই গাড়ীতে কিংসফোর্ড তখন ছিলেন না। ছিলেন দুইজন ইয়োরোপীয় নারী। তাঁরা নিহত হন। বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন যুবক ক্ষুদিরাম বসু এবং যুবক প্রফুল্ল চাকী।

শেষ পর্যন্ত, ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল বিদেশী শাসক ইংরাজের অনুচরের হাতে ধরা পড়েন। ধৃত হওয়া মাত্র, আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন। ইংরাজেরা বীর ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।

ঐ কিংসফোর্ড ছিলেন বঙ্গদেশের এক জেলাশাসক। সে ছিল এই দেশের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ। সে এই দেশের মানুষের উপর করেছিল অতি অমানুষিক অত্যাচার।

খৃষ্টীয় ১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে—বঙ্গের বিপ্লবীদের মধ্যের বিশ্বাসঘাতক নরেন্দ্র গোস্বামীকে বিপ্লবী বীর কানাইলাল দত্ত কারাগারে আগ্নেয় অস্ত্রাঘাতে নিধন করেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে—ইংরাজরাজের প্রতিনিধিকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয় কলিকাতাস্থ টাউন হলে। ভারতদ্বেষ্টাকে নিধনের সেই চেষ্টা সফল হয় নি।

তখনকার ইংরাজ শাসকের পুলিশের ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিধন করা হয়।

গুপ্ত সংবাদ প্রকাশক এক ব্যক্তির চিরসুপ্তি সংঘটন—নিধন।

খৃষ্টীয় ১৯০৯ সালে, ফেব্রুয়ারী মাসে—পুলিশ আদালতের মধ্যেই উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে নিধন।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ সকল শক্তিশালী উদ্যম। ঐ সকলের মধ্যে কেবল মাত্র কোন একটির সঙ্গে নয়, কয়েকটির সঙ্গেই সংযোগযুত ছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতার অপ্রতিম পূজারী শ্রীরাসবিহারী।

কলিকাতার মুরারিপুকুরের বোমার ব্যাপারের সঙ্গেও শ্রীরাসবিহারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

পরাধীনতাকে করতে খুন, চাই আগুন!—চাই আগুন!—যাঁর আছে অসাধারণ গুণ, তিনি প্রজ্বলিত করেন সেই গুণযুত আগুন।

দগ্ধ করতে ভারতে পরাধীনতা, উদ্ধার করতে ভারতের স্বাধীনতা শ্রীরাসবিহারী হয়েছিলেন আগুনের উদ্‌গাতা।

রাসবিহারী তখন পর্যন্তও হন নি নেতৃপদাধীকারী। তখন চলেছে তাঁর কর্মকৌশল আয়ত্ত করণের অধ্যায়।

মুরারিপুকুরের বোমার ঘটনার সময়ে, রাসবিহারী ছিলেন দেরাছনে বনবিভাগের কর্মী। ঐ সময়ে রাসবিহারী বিদেশী শাসক ও শোষকের বিষদৃষ্টি এড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন।

ভারতের স্বাধীনতার সাধকে বিষাদে পরিণত করার জন্যে, বিদ্বেষী বিদেশী শাসক এদেশের যে সকল সুসন্তানের উপর ক্রূরতা-কুঠার প্রয়োগ করেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনলপ্রভ অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামা বঙ্গজননীর সুসন্তান বিজ্ঞতার অগ্রবর্তী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ভারতরঞ্জন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, যথার্থ সুবোধ সুবোধচন্দ্র মল্লিক, জনগণের মিত্র কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভারতের বিদেশী দাসত্ব মোচন মন্ত্রে দীক্ষিত পুলিনবিহারী দাস, সদা সৎভাবভাবিত চিত্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, চারুচিত্ত চারুচন্দ্র রায়, স্বাধীনতাযাগে দীক্ষিত ভুপেশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি প্রতিভাবানগণ।

ঐ বিপ্লব-বন্যা দেশকে করেছিল শক্তিধন্যা। দেশের সর্বস্তরে আত্মমর্যাদা বোধ উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

তৎকালে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব বিদেশী শাসকের আদলতে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে বজ্রবাণী, সেইবাণী যেন মৃতসঞ্জীবনী: এই আমার মাতৃভূমি। এই আমার পিতৃভুমি। এই ভূমির নিমিত্ত আমার সামান্য শক্তিবিত্ত ব্যয়িত হয়েছে। এই ব্যয়, ব্যয় নয়—সঞ্চয়!—এর জন্য আমি কার কাছে দেব কৈফিয়ত! বিদ্বেষী বিদেশীর কাছে?—সেরূপ অধম-কর্ম মানুষকে কি প্রদান করতে পারে শর্ম।

এই দেশে হতে লাগল বিদ্বেষী বিদেশীর অত্যাচার, অবিচার, শঠতার ও ভেদনীতির জাল বিস্তার।

সভা-সমিতির ইতি ক'রে দেওয়া হতে লাগল বলপূর্বক। অনেক সংবাদপত্র শেষ ক'রে দেওয়া হল ব'লে সংবাদ বেরুতে লাগল।

হিন্দুদের হীন ও ক্ষীণ করার জন্য মত্ত হয়ে উঠল বিদেশী শাসকের ক্রুরতা ও কুটিলতা। হিন্দু ও মুসলমানকে প্রীতির পথ হতে বিচ্যুত করে রাখবার জন্য বিদেশী শাসক বদ্ধবৎ চেষ্টাশীল হ'ল।

শাস্তি, শাসানি ভ্রূকুটি টিপে ধরতে লাগল ভারতের স্বাধীনতা সাধনার টুঁটি।—আর, এদিকেও উদ্যত হ'ল বিপ্লবের বিপ্লব-বলের বজ্রমুঠি।

অনলসঞ্চারী রাসবিহারী

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই বাঘের দেশের বাঘা যতীন।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন এই দেশের তখনকার বিদেশী সরকারের কর্মী, একজন সাংকেতিক লিপিকার। শেষ পর্যন্ত বিদেশী-রাজ তাঁকে গণ্য করতে লাগল সাংঘাতিক লোক। কারণ তিনি সাংঘাতিক সংঘাত হানবার উদ্যম ক'রেছিলেন ভারতে বিদেশী শাসকের উপর।

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের কর্মে—সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করবার জন্য, যতীন্দ্রনাথ তাঁর চাকরির মায়া, জীবনের মায়া, তাঁর গৃহস্থ পরিজনগণের মায়া ব'লেই গণ্য করেছিলেন। ভারতের ভাস্করতা সম্পাদনের জন্য সেবানুষ্ঠানই তিনি জীবনের যথার্থ সত্য ও পথ্য ব'লে নির্ভুলভাবে সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

ভারতের সাগ্নিক ব্রাহ্মণের বংশধর যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের অগ্নি-সাধক হয়ে আবির্ভূত হলেন ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞের অঙ্গনে।

সেই পুরুষ যেন ছিলেন পাবক! কলিকাতায় তিনি হলেন বীর বিপ্লবীদের অধিনায়ক।

ভারতের পরাধীনতা করতে নাশ, যতীন্দ্রনাথের অনুবর্তী

রইলেন অবিনাশ—শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী অবিনাশের একমাত্র আশ বা আশা ছিল ভারতের স্বাধীনতা। তাই তিনি ভারতের ইংরাজ সরকারের অধীনে পদস্থ কর্মীর পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁর অর্থ-সামর্থও কম ছিল না। সে অর্থ অবিনাশ বিপ্লব সংঘটন কর্মে সম্পূর্ণ-রূপে উৎসর্গ করেন।

যতীন্দ্রনাথের আর এক সহকর্মী হলেন যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। বঙ্গের বিপ্লব ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অতি মহান।

স্বেচ্ছা-সৈনিকদল সংগঠন, জার্মানী হতে সমর বিশেষজ্ঞ এবং অর্থ আনয়ন—এই প্রচেষ্টাও যতীন্দ্রনাথ করেন।

ঐ সময়ে, রাসবিহারী ছিলেন দেরাদুনে বনবিভাগের অফিসে অন্যতম প্রধানকর্মী। ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার করার জন্য, ভারত-জার্মান যুক্ত উদ্যমে রাসবিহারী ছিলেন উদ্যমশীল।

বসন্ত বিশ্বাস নামক এক যুবক বোমা নির্মাণ কর্মে ছিলেন সুদক্ষ। তিনি তখন যোগদান করলেন রাসবিহারীর সঙ্গে। ভারতের ইংরাজ শাসক হার্ডিঞ্জের জীবন হরণ করার জন্য চেষ্টা হ'ল। সেই ঘটনার পরে রাসবিহারী বনবিভাগের চাকরি পরিত্যাগ করলেন—ভারত-মাতার সেবার পথ অবলম্বন করলেন।

ভারতের উত্তর অঞ্চলে রাসবিহারী বিপ্লবের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করণ কর্মে হয়ে পড়লেন অতন্দ্রসাধক।

বিপ্লব ক্ষেত্রে রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথ তখন হাতে মিলিয়েছেন হাত। তাঁরা দেরাদুন, চন্দননগর এবং বারাণসী প্রভৃতি স্থানে সম্মিলিত হতেন ; বিপ্লব প্রচেষ্টার পন্থা স্থির করতেন।

রাসবিহারী ছিলেন বহুভাষাবিদ। তিনি ছিলেন কর্মকুশল, সাধনায় অবিচল। তাই বিপ্লবের নেতৃত্ব তাঁকে বরণ করল। তিনি সৈন্যদের নানা ছাউনিতে সংযোগ স্থাপন করতে লাগলেন। সৈন্যরা যাতে বিপ্লবে যোগদান করে ধন্য হ'ন, সেই হল রাসবিহারীর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা।

পাঞ্জাবে ছিল বিপ্লবী গদ্দর দল। তার নেতা ছিলেন হরদয়াল। হরদয়াল গ্রেটবৃটেনে অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা লাভের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য হরদয়াল বিলাতী-পাঠ পরিত্যাগ করেন। তিনি আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম' নামক একটি সংস্থা স্থাপন করেন।

বিপ্লবী সত্যেন্দ্র সেন এবং মারাঠী ব্রাহ্মণ যুবক পিঙ্গলে ঐ সময়ে ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সত্যেন্দ্র অবস্থান করলেন বঙ্গদেশে। পিঙ্গলে যোগদান করলেন রাসবিহারীর সঙ্গে। প্রকৃষ্ট কর্মী পিঙ্গলে ভারতের সর্বত্র গমন করতেন; বিভিন্ন বিপ্লব-কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতেন, আর সর্বত্র বিপ্লবের বীজ বপন করতেন।

যারা এদেশে ইংরাজ সরকারের কর্মী হয়ে লাভ করত প্রচুর অর্থ, আর নষ্ট করতে চেষ্টা করত ভারতের স্বার্থ, ভারতের স্বাধীনতার সাধনা করতে চাইত ব্যর্থ, সেই সব অত্যাচারীকে পৃথিবী হতে অপসারিত করার জন্য খৃষ্টীয় ১৯০৭ সালে চেষ্টা করা হয় বার বার। তার ফলে সরকারী দমন দণ্ডও হয়ে উঠল দুর্বার। গুপ্তচরদল হল ক্রূর সর্পবৎ ক্রিয়াশীল।

রাসবিহারী তখন সেইসব দুঃশীলকে পরাভূত করবার জন্য কি করলেন? তিনি একটি দল গঠন করলেন। সেই দলটির কাজ হল সরকারী গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করা। বিভিন্ন রকম সরকারী কর্ম-ক্ষেত্রে সেইদলের লোকেরা অবস্থান করতেন। তাঁদের অনেকে ছিলেন এই দেশের একটি সুপ্রসিদ্ধ আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্মচারী। ভগবান-ভক্তি ও ভারতের প্রতি ভক্তি এই দুইটিকে সেই সৎপথ অবলম্বী ব্রহ্মচারীরা নির্ভুলভাবে এক এবং অখণ্ড ব'লে গণ্য করেছিলেন।

রাসবিহারী নায়ক হলেও অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর ভ্রম-প্রমাদ গুলো সম্পর্কে তিনি অন্যান্য কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। সেগুলো সংশোধন করতেন।

হার্ডিঞ্জের হাড় চূর্ণন চেষ্টা

ভারতের রাজধানী দিল্লী। খৃষ্টীয় ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৫শে তারিখ দিল্লীতে সেদিন যেন একটা দিন। সেদিন সেখানে তখন বাদিত হচ্ছে বিদেশী ইংরাজ রাজের জয়ডিণ্ডিম।

কেন?

তখনকার ইংরাজাধীন ভারতের ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি হার্ডিঞ্জ দিল্লীতে প্রবিষ্ট হচ্ছেন ব'লে।

দিল্লীধাম তখন দর্শন করছে কত ধুমধাম। ঘোষিত হচ্ছে ইংরাজের নাম।

তখন হঠাৎ একটা শব্দ—ভীষণ শব্দ!—জব্দ করা, স্তব্ধ করা শব্দ! সেই শব্দ ভারতে সূচিত করল যেন এক নব অব্দ।

সেই শব্দ কিসের শব্দ?

বোমার শব্দ।

সেই বোমা কি উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত?

হার্ডিঞ্জের হাড় গুঁড়া করবার জন্য। কিন্তু হার্ডিঞ্জের হাড়ের উপর বোমা পড়ল না। হার্ডিঞ্জ নিহত হলেন না।

কে তিনি, যিনি হার্ডিঞ্জের হাড় চুরমার করতে চাইলেন?

তিনি বীর বিপ্লবী যুবক বসন্ত বিশ্বাস।

কে সেই বীরের প্রেরণাদাতা এবং তাঁর পথপ্রদর্শক?

বীর বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

সেই ব্যাপারে বিদেশী শাসক বীর বসন্তের করল প্রাণান্ত– ফাঁসি দিল। বীর বসন্ত ভারতের বিদেশী বশ্যতার নিঃস্ব গ্রীষ্ম নিঃশেষ ক'রে ভারতে স্বাধীনতা বসন্ত সঞ্চার চেষ্টায় আত্মদান করেন।

বোমানিক্ষেপের সে দৃশ্যের পর, বীর বসন্ত বিশ্বাস অদৃশ্য হন।

তাঁর পশ্চাতের প্রেরণাসঞ্চারী রাসবিহারী ভারতের স্বদেশী শাসকের গুপ্তচরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে, রাসবিহারী গোপনে

প্রাণপণে ভারতের সেবা করতে থাকেন।—ভারতের নানাস্থানে বিদেশী বশ্যতার অসুরনাশের বিপ্লব প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন বিপ্লবীনায়ক রাসবিহারী।

বিদেশী সরকারের গুপ্তচর সর্বত্র সঞ্চরণ করতে লাগল চোরের মতো। তারা জানতে পারল হার্ডিঞ্জের হাড় চুর্ণন চেষ্টায় কার হাত বোমাবর্ষণ করেছিল। জানতে পারল কার প্রেরণা সেই বোমাগ্নির ইন্ধন প্রদান করেছিল।

কিন্তু বিদেশী শাসকের চর রাসবিহারীর অবস্থান স্থান খুঁজে বার করতে পারল না। তখন বিদেশী সরকার রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য হুলিয়া বার করেন। ভারত বিদ্বেষীদের বিদ্বেষবিষাক্ত সেই হুলিয়া যেন হুল ফুটিয়ে দিতে চাইল ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায়। রাসবিহারীকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় সরকারের হাতে অর্পণ করবার জন্য প্রচুর অর্থ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হল। নানা প্রকাশ্য স্থানে রাসবিহারীর আলোক চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হল।

ঐ সময়ে রাসবিহারী তখনকার ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে মাসখানেক কাল অবস্থান করেন।

রাসবিহারীর পিতা বিনোদবিহারী এবং তাঁদের পরিবারবর্গ যাদের করেছিলেন নানারূপ হিত, সেই হিত প্রাপ্তরা তখন করেছিল রাসবিহারীর অহিত—তারা বিদেশী শাসকের নিকট হতে অর্থ লাভ ক'রে রাসবিহারীর সম্বন্ধে গুপ্তচরদের সন্ধান দান করে।

রাসবিহারী একাধিক বার গ্রেপ্তার হয়ে পড়ার মতো সংকটে পতিত হন। কিন্তু বুদ্ধি বলে, সাহস-বলে সে সংকট অতিক্রম করেন। ঐ ব্যাপারে বিদেশী সরকারের গুপ্তচর ও পুলিশ রাসবিহারীর সন্ধানলাভের জন্য রাসবিহারীর পিতা, অন্যান্য পরিবারবর্গ এবং নানা আত্মীয় স্বজনের প্রতিও নানারূপ দুর্ব্যবহার করেছিল।

আর, ওদিকে আত্মগোপনকারী রাসবিহারী তখন ভারতের নানাস্থানে বিদেশী বিতাড়নের স্বাধীনতা সংগ্রাম কেন্দ্র গঠনে তৎপর।

রাসবিহারীর বিরুদ্ধে বৃটিশ পশুরাজ

বৃটিশ পশুরাজের দিল্লীস্থ বিচারালয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন তৎপর বীর রাসবিহারী এবং বীর বসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা মত্ত হয়ে উঠল।

রাসবিহারীর বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকার পক্ষের অভিযোগ হ'ল একাধিক:

(ক) সরকারের উচ্ছেদ উদ্দেশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

(খ) নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান।

(গ) বিস্ফোরক দ্রব্য সম্বন্ধীয় বিধি লঙ্ঘন, বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ, বিস্ফোরক বোমা নির্মাণ, বিস্ফোরক বোমা ব্যবহার করণ, অবৈধভাবে অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করণ।

জনশ্রুতি এইরূপ যে সেই মোকদ্দমাকালে, বীর রাসবিহারী এক দিন ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হন, স্বহস্ত লিখিত এক বিবৃতি বিচারকের সমীপে প্রেরণ করেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর স্বাক্ষর এবং হস্তাক্ষর দর্শনে বিচারক স্তম্ভিত হন। তাঁর আদেশে, বিচারশালার সকল দ্বার তখনই রুদ্ধ হয়ে যায়। সেখানে রাসবিহারীর অনুসন্ধান করা হয়।

কিন্তু রাসবিহারী তখন কোথায়?

দিল্লীর সর্বত্র চলে রাসবিহারীকে ধৃত করার প্রবল চেষ্টা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুপ্তচর বিভাগের এক পদস্থ বাঙ্গালী কর্মী একদা বীর রাসবিহারীর মধ্যম ভ্রাতাকে ব'লেছিলেন, রাসবিহারীর জীবনের অভিধানে 'ভয়' বলে কিছু নেই; 'অসম্ভব' ব'লে কিছু নেই।

রাসবিহারী তখন ধৃত না হলেও, ভবিষ্যতে ধৃত হতে পারে, এই

মনে ক'রে, তখনকার সরকারী-কর্মী রাসবিহারীর পিতা বিনোদ বিহারী ঐ মামলার নথি-পত্রাদির প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। সেই কার্যে হরিচরণ ঘোষাল নামক একজন নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মী বিনোদ বিহারীকে উপযুক্তরূপ সাহায্য দান করেছিলেন। পক্ষান্তরে অন্য অনেকেই বৃটিশ পশুরাজের ক্রোধোদ্রেক ভীতি বশতঃ বিনোদ বিহারীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিল।

রাসবিহারীর বিরুদ্ধে যখন ঐরূপ বিপদ ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদান করছে, তখন পণ্ডিচেরী হতে শ্রীঅরবিন্দ যেরূপে সম্ভব রাসবিহারীর আনুকূল্য করার জন্য শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। নিজেও যথাসাধ্য সাহায্য দানে একান্তভাবেই ইচ্ছুক হন।

নায়কের ন্যায়নিষ্ঠা

বারাণসীর বিপ্লবকেন্দ্রের এক যুবক, তাঁর নাম প্রিয়নাথ। বিপ্লব কর্মে তিনি করছিলেন যেন প্রাণপাত। কিন্তু সহসা প্রিয়নাথ হয়ে পড়লেন উন্মাদ। তখন নানারকম গোপনীয় তথ্য তিনি প্রচার করতে লাগলেন এখানে ওখানে সেখানে। তাঁর রোগের চিকিৎসা হ'ল। কিন্তু রোগ দূর হল না। ওদিকে, ইংরাজের গুপ্তচর তখন অতিশয় তৎপর।

নায়ক রাসবিহারীর নিকট বার্তা এল পাগল প্রিয়নাথের হাত হতে পরিত্রাণের উপায় কি, নির্দেশ দিন।

রাসবিহারীর নিকট হতে নির্দেশ এল: প্রিয়নাথের প্রাণদণ্ড।

হত্যার জন্য হত্যাকারী বা ঘাতকও একজন স্থির হল। কিন্তু কিয়ৎকাল পূর্বে, প্রিয়নাথকে দর্শন করে রাসবিহারী বুঝেছিলেন, প্রিয়নাথের পাগলামি তখন আর নেই—তিনি উন্মাদ রোগমুক্ত। কিন্তু প্রিয়নাথের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ সম্বন্ধে তখন এমন একটা অবস্থা হয়ে

পড়েছে যে, প্রাণদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার ক'রে সেই বার্তা ঘাতককে জানানোর আর সময়ও নেই—ঘাতক অবিলম্বেই প্রিয়নাথের মস্তক তাঁর দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।

তখন সহসা কেউ কেউ দেখল, একজনে প্রিয়নাথকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বেগে ধাবমান হলেন এবং কম্পহীন প্রাণে ঝম্প প্রদান করলেন গঙ্গাগর্ভে। তাঁরা পরপারে পৌঁছলেন। তখন প্রিয়নাথ কোন এক স্থানে অবস্থিতি করলেন। আর তাঁর সঙ্গীটি বিপ্লবকেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন করলেন।

প্রিয়নাথের সেই সঙ্গীটি কে? বিপ্লবী নয়ক রাসবিহারী। তারপরে, রাসবিহারী প্রিয়নাথের প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ নিজেই নস্যাৎ ক'রে দিলেন।

বিপ্লব-প্লব কাণ্ডারী রাসবিহারী

ভারতের পরাধীনতা পারাবার ভারতে বিপ্লব-প্লবযোগে উত্তরণ করানোর নিমিত্ত রাসবিহারী হয়েছিলেন কাণ্ডারী

কেহ কাহাকেও নেতৃত্বপদে আসীন ক'রে দিতে পার না।—নিজগুণে নেতৃত্বপদ প্রাপ্ত হতে হয়। যাঁরা নেতা হন, তাঁরা নিজের বুদ্ধি বলে ও বিক্রম বলেই তা হন। রাসবিহারীও সেইরূপেই নেতা হয়েছিলেন। নেতৃত্বের আসন অধিকার করবার জন্য রাসবিহারী লুব্ধ ছিলেন না। আসন তাঁকে বরণ করবার জন্য হয়েছিল ব্যাকুল।

দরিদ্র গৃহস্থের পুত্র রাসবিহারী, নানা সুনীতি অবলম্বন ক'রে, ভীতি বর্জন ক'রে ভারত ভূমির প্রতি প্রীতি তাঁর জীবন পথের পাথেয় ক'রে, নেতৃত্বপদ করতলগত করেছিলেন।

অগ্নির আরাধনার ঐতিহ্যময় এই ভূমিতে রাসবিহারী অগ্নির পথ অবলম্বন করেছিলেন।

অগ্নির পথই যে প্রকৃষ্ট পথ, কেবলমাত্র রণক্ষেত্রেই যে তার প্রমাণ, তা নয় ; বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ও কারিগরি ক্ষেত্রেও তারই দেখা যায় দৃষ্টান্ত। অগ্নির বলে নানাবিধ কলকারখানা চলে এবং ধ্বংসের অস্ত্র সক্রিয় হয়। যে দেশ ঐরূপে অগ্নির সাধক, সেই দেশ হয় জগতের নায়ক।

যাঁরা অগ্নির ঐরূপ আরাধনায় বিমুখ, উন্নতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তি তাদের প্রতি বিমুখ ; তারা জীবনে লাভ করে শুধু দুঃখ।

গুরুত্বযুক্ত বিপ্লবকেন্দ্র কোন্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় ? প্রতিষ্ঠিত হয় একটি উদ্যান বাটিকায়।

কোথায় সেই উদ্যান বাটিকা ?

দেরাদুনে।

কে সেই বাটিকার মালিক ?

শ্রী পি. কে. ঠাকুর।

সেই বাটীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন অতুলনীয় পদবাচ্য অতুলচন্দ্র ঘোষ।

সেই নির্জন বাটিকায় চলেছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বিপ্লব-সাধনা।

সেই উপবন-ভবনে বহু বিপ্লবীই রাসবিহারীর সঙ্গে সমবেত হতেন। বিপ্লবী অবোধবিহারী প্রভৃতিও তাঁদের অন্যতম।

কিন্তু একদা সেই বিপ্লবকেন্দ্র বিলুপ্ত হ'ল।

কখন বিলুপ্ত হ'ল ?

বিদেশী শাসক হার্ডিঞ্জের হাড় চুরমার করবার প্রচেষ্টার পর।

তখন সেই কেন্দ্র প্রয়োজন মতো, নানাস্থানেই স্থানান্তরিত করতে হ'ল।

ভারত-বিদ্বেষী বিদেশীর মন্তব্য

মানুষের গুণ এতই শক্তিশালী যে সেই গুণ তাঁর শত্রুর হৃদয়কেও প্রশংসাশীল ক'রে তোলে।

বিদেশী মাইকেল ও' ডায়ার ছিল যেন ভারত বিদ্বেষের এক অবতার। ডায়ার একখানি বই লিখে গেছে। আমাদের ভাষায়, সেই বইয়ের নাম "ভারতকে আমি যেরূপ জানতাম।"

বর্তমানে লাহোর শহর রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তখনকার পরাধীন অখণ্ড ভারতের লাহোর শহর হতে বিপ্লবানল ছড়িয়ে দিয়ে বিদেশী শাসন পুড়িয়ে দিয়ে, ভারতকে স্বরাজ-সাজবিমণ্ডিত করবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপ্লব-প্লবকাণ্ডারী ছিলেন রাসবিহারী, ধৃত তরবারি।

কিন্তু বিদেশী শাসকের পোষা কয়েকটা এদেশীয় শ্বা—স্বদেষদ্বেষী বিশ্বাসঘাতক ভারতের সেই সাধনার হ'ল বিঘাতক।

লাহোর হতে বিপ্লব অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা পণ্ড করে ফেলল তারা।

সেই সম্বন্ধে মাইকেল ও' ডায়ারের প্রদত্ত বিবরণের কিয়দংশ এইরূপ ঃ

"এই সময়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের নায়ক ছিলেন রাসবিহারী বসু। তিনি লাহোর হতে বিপ্লবানল প্রজ্বলিত করতে চাইলেন। তাঁর অন্যতম প্রধান সঙ্গী হলেন এক মারাঠী ব্রাহ্মণ যুবক। নাম ঃ ইউ. জি. পিঙ্গলে। পিঙ্গলে অপ্রতিম সাহসী। পিঙ্গলে ছিলেন আমেরিকায়। শিখ বিপ্লবীরা ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। পিঙ্গলেও তাঁদের সঙ্গেই আগমন করেন। তখন নায়ক হচ্ছেন রাসবিহারী। আর ইউ, জী, পিঙ্গলে রাসবিহারীর বীর সহকারী। লাহোরস্থ আর্য-সমাজ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ভাই পরমানন্দ। তিনি

হিন্দু-বিপ্লবী ও শিখ-বিপ্লবীদের মধ্যে সংযোগ-সূত্র রক্ষা করেন। আমাদের গুপ্তচর ৩১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের একটা সংবাদ দিল: রাসবিহারী বসু এবং ইউ. জি. পিঙ্গলে তাঁদের বিপ্লব অভ্যুত্থানের প্রধান ঘাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন লাহোর শহরে।

রাসবিহারী বসু এবং তাঁর সহকারী ইউ. জি. পিঙ্গলের সন্দেহ সঞ্জাত হয়, যে আমাদের সরকার তাঁদের সমুদয় কার্যকলাপ এবং অভিসন্ধি অবগত হয়েছেন। তখন তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহ-সংঘটনের তারিখ একদিন অগ্রবর্তী ক'রে দেন। তাঁরা স্থির করলেন, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর গভীর নিশায় তাঁরা বিদ্রোহ-অভ্যুত্থানের আগুন প্রজ্বলিত করবেন। তাঁরা তাঁদের সেই অভিসন্ধির সংবাদ সরবরাহ করলেন নানা সৈন্যাবাসে এবং তাঁদের বিপ্লব-কেন্দ্রে। তখন আমরাও আর এক নিমেষকালও বিলম্ব করলাম না—কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম।

সেই দিবসেই আমাদের পুলিশ ভারতীয় বিপ্লবীদের চারখানি বাড়ীতে খানাতল্লাসী চালাল। হস্তগত করল অনেকগুলো বোমা। বোমা নির্মাণের নানাবিধ দ্রব্য, বিপ্লব-প্রচার পুস্তিকা, বিপ্লব-পতাকা। গ্রেফতার করল মোট ১৩ জন বিপ্লবীকে। কিন্তু নেতা ও তাঁর প্রধান সহকারীকে অর্থাৎ রাসবিহারী বসু এবং ইউ. জি. পিঙ্গলেকে—আমাদের বেড়াজালে বন্দী করা সম্ভবপর হ'ল না।

কিন্তু আমাদের গোয়েন্দারা রইলেন ভারতীয় বিপ্লবীর সন্ধান কার্যে অতন্দ্র প্রহরী। তাই উক্ত ঘটনার কতিপয় দিবস পরেই, ইউ. জী. পিঙ্গলেকে গ্রেফতার করা সম্ভবপর হল মিরাটে। তাঁর সঙ্গে তখন ছিল বহু বোমা। সেই বোমা বঙ্গদেশ হতে সংগৃহীত।

অস্ত্র-বিশেষজ্ঞরা বলেন, "ঐ সকল বোমা দিয়ে এদেশে বিলাতের রাজসিংহাসন টলিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব হত।"

বিপ্লবী দলের একজনের নাম ছিল দীননাথ। সে ছিল দীনচিত্ত, হীনচিত্ত। দীননাথ তার জননী জন্মভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

করল—লাহোর অভ্যুত্থান উদ্যমের কথা ইংরাজকে জানিয়ে দিল। তার ফলে, লাহোরে আর ভারতীয় স্বাধীনতা-সাধনার অভ্যুত্থান অগ্নি সবিক্রমে জ্বলে উঠতে পারল না। তবু বীরনেতা রাসবিহারী সংগ্রাম পরাঙ্মুখ হলেন না। কিন্তু শত্রুপক্ষের যন্ত্রচালিত কামান উদ্গীরণ করল অনল বান; বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা তখনকার মতো পণ্ড করে ফেলল।

রাসবিহারী বসুর বুদ্ধি ও বহু ভারত-চন্দ্রকে বিদেশী রাহুমুক্ত করার পক্ষে সম্পূর্ণরূপেই সমর্থ ছিল, মাইকেল ও' ডায়ারের ঐ অভিমত তারই প্রমাণ দিল।

ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার যজ্ঞের অনল সঞ্চারী ধৃততরবারি রাসবিহারী।

স্বরাজ রণের জন্য—মরণ এড়ানোর জন্য নয়

ভারতে রাসবিহারীর সম্পাদিত বীরকর্ম প্রমাণিত করে, যে তিনি বিপুল সংগঠন শক্তি ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ভারত সেবার ভাবে বিভোর ছিলেন।

লাহোর-অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে যাওয়ায়, রাসবিহারী যে অবস্থায় পতিত হন, সে অবস্থার যে কোন সময়ে এদেশের বিদেশী শাসকের বিদ্বেষবিষ তাঁর জীবন বিনষ্ট করে ফেলতে পারত,—এবং সেই সম্ভাবনাই ছিল প্রবল।

রাসবিহারীর বিপুল শক্তি ঐরূপে বিনষ্ট হয়ে গেলে, ভারতের হত বিপুল ক্ষতি; বিদেশী শাসকের হত বিপুল লাভ।

—সুতরাং রাসবিহারীর বেঁচে থাকাই ছিল যুক্তিযুক্ত এবং ভারতের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

রাসবিহারী যে জাপানে গমন করেছিলেন, সেটা আরামের জীবন যাপনের জন্য নয়, তাঁর ভারত সেবার পণ পূর্ণ করার জন্যই।

ভারতের পরাধীনতা শৃঙ্খল চূর্ণ করার জন্য চীন ও জাপানে অস্ত্র সংগ্রহের সম্ভাবনাও কম ছিল না।

রাসবিহারী ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারে রণ করার জন্য জাপানে গমন করেন,—মরণ এড়ানোর জন্য গমন করেন নি।

ভারত ভাব-বিভোর একজন বিপ্লবীর নাম ছিল শ্রীশচন্দ্র ঘোষ।

একদা চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় ইংরাজের কৌশল-জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন, শ্রীশচন্দ্র তখন চারুচন্দ্রের পরিজনগণের পরিপোষণের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন? কি করে শ্রীশচন্দ্র সেই স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব পালন করতেন? সেটি তিনি করতেন গামছা ও তাঁতবস্ত্র ফেরি ক'রে বিক্রয় ক'রে। ইংরাজের বন্দীশালায় বহুকাল বন্দী ছিলেন বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র।

শ্রীশচন্দ্রই নাকি ইংরাজের কারাবন্দী বীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্তকে অস্ত্র যোগাইয়াছিলেন সেই বন্দীশালায়।

শ্রীশচন্দ্রের অভিমত হতে প্রকাশ পেয়েছে, মৃত্যুর গ্রাস-ত্রাস রাসবিহারীকে ভারত ত্যাগ করায় নি। মরণ এড়ানোর জন্য নয়, ভারতের স্বাধীনতার রণ চালানোর জন্যই রাসবিহারী জাপানে চ'লে যান। রাসবিহারীর বন্ধুরাও রাসবিহারীকে ভারত হতে চ'লে যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে ব'লেছিলেন জার্মানীতে চ'লে যেতে।

তখন রাসবিহারী যে অভিমত প্রকাশ করেন, সেটি এইরূপ: জার্মানীতে যাওয়া হবে না। ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারের অনেক কর্মী সেখানে রয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশ এদেশকে পশ্চাতেই রাখতে চায়। বিপ্লবী-শিক্ষণ গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে রাশিয়া। কিন্তু রাশিয়ায় গমন করার বহু বাধা। তাই পূর্ব দিকে যাত্রা করতে হবে। ভারতের পূর্বদিকবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্যও

প্রচুর। সে সব দেশ, ইচ্ছা করলে, ভারতের ভ্রাতা-ভগিনীর কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

ঐ সময়ে রাসবিহারী আত্মগোপন ক'রে অবস্থান করছিলেন কলিকাতার শিয়ালদহ ডাকঘরের অফিসের উপর। ইংরাজের গোয়েন্দা তখন যেন করছে তাঁর নাম ধ্যান। আর করছে তাঁর সন্ধান।

ভারতের দীপ জাপান অভিমুখে

ভারতের স্বরাজ-রণ-কাণ্ডারী রাসবিহারী জাপান অভিমুখে। ভারতের স্বরাজ সাধনা-সাধ তাঁর বুকে।

চললেন রাসবিহারী, যেন আঁধার ঝড়ের রাতে দীপধারী পথচারী।

বীর রাসবিহারীর বয়ঃক্রমের বর্ষসংখ্যা তখন উনত্রিশ—তিনি বয়সে উন, কিন্তু গুণ দিয়ে ভরা তাঁর চিত্ত-তূণ।

খৃষ্টীয় ১৯১৫ সাল। মে মাস। ১২ তারিখ।

কলিকাতা হতে যাত্রা করল জাপানী জাহাজ। জাহাজের নাম "সানুকিমারু"। ঐ জাহাজের একজন যাত্রীর নাম পি. এন. ঠাকুর। প্রকৃত পক্ষে, ঐ ছদ্মনাম গ্রহণ ক'রে, জাপান অভিমুখে চলেছেন ভারতের স্বরাজযজ্ঞের পুরোহিত ঠাকুর রাসবিহারী বসু।

শোনা যায়ঃ এক ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তি বন্ধক রাখেন। তাই ক'রে কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে, সেই অর্থ রাসবিহারীর করে প্রদান ক'রেন, তিনি দেন রাসবিহারীর জাপান যাত্রার ব্যয়ের ব্যবস্থা ক'রে —স্বীয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে, তিনি তাঁর বন্ধুর সংকট বন্ধুর পথের জন্য বন্ধুর কাজ করেন।

সেই ব্যক্তি কে? তিনি হচ্ছেন উপন্যাস রাজ্যের রাজা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অর্ণবযানে আরোহণানন্তর রাসবিহারী তাঁর টিকিট পরিবর্তন করলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী হওয়ার টিকিট ক্রয় করলেন।

তিনি নানারূপ বিচার-বিবেচনা করে, ঐ কাজটি করেন নি—করলেন যেন কোন এক অদৃশ্যশক্তির মন্ত্রণায়।

রাসবিহারী জাহাজে তাঁর কেবিন মধ্যে প্রবিষ্ট হলেন।

ঐ সময়ে কলিকাতায় পুলিশের বড়কর্তা ছিল টেগার্ট। টেগার্ট ছিল এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শত্রু। সে ছিল এই দেশের বীর বিপ্লবীদের উপর অত্যন্ত অত্যাচারপরায়ণ। তার চিত্ত ভারতের ন্যায়সংগত স্বাধীনতাসংগ্রাম নস্যাৎ ক'রে দেওয়ার জন্য বন্যবৎ নৃত্য করত। টেগার্টের মধ্যে ভারতবিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল, যে সে বিদ্বেষ ছিল বিষের অপেক্ষাও মারাত্মক।

টেগার্ট রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টায় তার বুদ্ধি ও চেষ্টা নিয়োজিত করেছিল। সে ঐ সময়ে 'সানুকিমারু' জাহাজে প্রবেশ করে সেই জাহাজের যাত্রীদের প্রতি তার সর্পদৃষ্টি নিক্ষেপ করল। প্রত্যেকটি কেবিনে প্রবেশ করল। তন্ন তন্ন ক'রে রাসবিহারীর সন্ধান করল। কিন্তু, কে জানে কি কারণে, টেগার্ট একটি কেবিনের ভিতর প্রবেশ করল না। আর সেই কেবিনের মধ্যেই তখন ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা-মেধের মধ্যে মানব রাসবিহারী।

রাসবিহারীর কর্ণ তখন উৎকর্ণ।

জাহাজের কর্তৃপক্ষ এবং টেগার্টের মধ্যে তখন যে কথাবার্ত্তা হ'ল, তা রাসবিহারীর কর্ণে প্রবেশ করল।

কিছু কাল পরে, টেগার্ট জাহাজ থেকে নেমে গেল। যেন একটা সাপ নেমে গেল।

জাহাজ কলিকাতা ত্যাগ করল।

ভারত সেবাব্রতধারী রাসবিহারী ভারতের ভূমি হতে বিচ্ছিন্ন হলেন। কিন্তু ভারতের ভাতি বাতি হয়ে দেদীপ্যমান রইল তাঁর চিত্তপীঠে।

মৃন্ময় দেহে চিন্ময় চিত্ত

রাসবিহারী যখন কলিকাতা ত্যাগ ক'রে জাহাজে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার দুইজন সমমর্মী ও সহকর্মী সেখানে সমুপস্থিত।

তাঁদের মধ্যেকার একজনে রাসবিহারীকে বলেন, পথে তোমার আত্মরক্ষার জন্য কোন অস্ত্র সঙ্গে থাকা দরকার।

অবিচল অচঞ্চল রাসবিহারীর উত্তর হল তখন এইরূপ : শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্যোধনের সভায় প্রবেশ করে, তখন তিনি কি সশস্ত্র হয়ে প্রবেশ করেছিলেন? আমি শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-অর্পণ করেছি সেই বহুকাল আগে। আত্মজীবন রক্ষার্থে আমি কখনও অস্ত্রশস্ত্র চালনা করিনি। যে কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আমি পৃথিবীতে এসেছি, সে কর্মসম্পাদনের যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমি বিদেশীর হাতে বন্দী হব। আমার করণীয় যদি এখনও কিছু থাকে তা হ'লে কার সাধ্য যে আমায় বন্দী করে।

চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় মহোদয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ কালে, রাসবিহারী একদা যা বলেছিলেন, তার রূপ হচ্ছে এইরূপ : আমরা ঈশ্বরের যন্ত্র—ঈশ্বরেরই আত্মপ্রকাশ। মতিলাল তাই নয় কি? আমাদের নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে যেতে হবে। দুই খানি হস্ততলে মস্তক চেপে ধ'রে, সম্মুখে আগুয়ান হতে হবে। বেশ, বেশ! তাই হবে! তাই হবে!

—ঐ হ'ল রাসবিহারীর মৃন্ময় দেহের চিন্ময় চিত্তের চিত্র।

প্রহরণ-আহরণ প্রচেষ্টা

বীর রাসবিহারী—ভারতের বিদেশী শাসকের বিরচিত বিপদ সমুদ্রে প্লবমান বিপ্লবী রাসবিহারী—এইবার জাপান দেশের 'কোবে' নামক নগরে অবতরণ করলেন। কিন্তু চিত্তে তাঁর আত্মত্রাণের চিন্তা মোটেই নেই; তাঁর চিন্তা ভারতের স্বাধীনতালাভের নিমিত্ত।

তিনি গমন করলেন জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের প্রহরণ-আহরণ-উদ্দেশ্যে টোকিও হতে গমন করলেন চীনের সাংহাই নগরে। কিন্তু তাঁর সেই প্রহরণ-আহরণ-প্রচেষ্টা সুফল-প্রসূ হল না।

পরবর্তীকালে যিনি হয়েছিলেন চীনের চিত্তজয়ী, সেই বিচিত্র কর্মা সান ইয়াৎ সেন তখন তরুণ। রাসবিহারীর সঙ্গে সান ইয়াৎ সেনের পরিচয় ও প্রীতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে টোকিওতে।

শ্রদ্ধেয় সান ইয়াৎ সেন রাসবিহারীর প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন, যে একবার তিনি নিজের জীবন পণ করে রাসবিহারীর জীবন অটুট রেখেছিলেন।

ভারতের প্রতি জাপানের প্রীতি আকৃষ্ট করবার জন্য, রাসবিহারী ভারতের অতীত ও তখনকার অবস্থা জাপানীদের গোচরীভূত করতে সচেষ্ট হলেন। খৃষ্টীয় ১৯১৫ সালের ২৭শে নভেম্বর একটি সভার ব্যবস্থা হল। ঐ ব্যাপারে, জাপানের দিক থেকে উদ্যোগী ছিলেন ডক্টর সুমেই ওহ কাওয়া ; আর ভারতের পক্ষে ছিলেন রাসবিহারী, পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায় এবং ভারতীয় বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্ত।

যুনো উদ্যানে সিওকিনে প্রসিদ্ধ পান্থনিবাস। সেই স্থলে অনুষ্ঠিত হ'ল সেই সভা। জাপানের জাতীয় সংগীত সর্বপ্রথমে হ'ল ঝংকৃত। তার পরে হল ভারত সম্বন্ধীয় ভাষণ। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ যে ভাষণ দান করলেন, তাতে তিনি যেন সমগ্র সভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেললেন।

জাপানস্থ বৃটিশ দূত সেই সংবাদ অবগত হলেন। তিনি জাপানী পররাষ্ট্র বিভাগকে অনুরোধ জানালেন : জাপান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের বিতারিত করা হোক।

তখন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ আমেরিকায় প্রস্থান করলেন।

রাসবিহারী এবং হেরম্বলালের প্রতি জাপান সরকারের আদেশ বিঘোষিত হল : জাপান ত্যাগ কর, পাঁচ দিনের মধ্যেই কর।

রাসবিহারী ও হেরম্বলালের তখন কী শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু তারা ভারতের স্বাধীনতাকে ধ্রুব তারার মতো লক্ষ্য করছেন। তাই ব্যাকুল হলেন না। তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠ বক্তব্য শ্রবণ করে, জাপানের বহু বিখিষ্ট সংবাদপত্র বা বার্তাপত্র এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাদের পক্ষে সমর্থন করে, তাঁদের প্রতি জাপান-ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য জাপানী সরকারকে অনুরোধ জানালেন!

কিন্তু সেই অনুরোধের উত্তর বেরুল এইরূপ: ইয়াকোহামা হতে জাহাজ ছাড়বে ১৯১৫ সালের ২রা ডিসেম্বর। রাসবিহারী বসু এবং হেরম্বলাল গুপ্তকে সেই জাহাজের যাত্রী ক'রে দেওয়া হবে বলপূর্বক।

ঐ ঘটনার কিয়ৎ দিবস পূর্বে, সাধুকল্প এম্, টোয়ামা-এর সঙ্গে রাসবিহারীর পরিচয় হয়। সেই শ্রীটোয়ামা সামুরাই নেতা। তিনি অহিংসবাদী। তিনি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠাবশে, রাসবিহারীও হেরম্বলালের সহায়তা করতে সম্মত হন।

ডিসেম্বরের অম্বর

ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়কে ২য়া ডিসেম্বর বলপূর্বক জাহাজে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে,—জাপানী সরকারের এই ব্যবস্থা। ওর পূর্বে, ১লা ডিসেম্বর। কিরূপ তখন ঘটনা সমাবেশ ক্ষেত্রের অম্বর?

একখানি গৃহের অভ্যন্তরে রয়েছেন রাসবিহারী এবং হেরম্বলাল। তাঁদের চিত্ত তখন উত্তাল। কিন্তু মুখের ভাব নির্বিকার। যেন যোগযুক্ত সমাধিস্থ দুই পুরুষ। মস্তকের উপর বজ্রমেঘ। তবু তাঁরা নিরুদ্বেগ। সাংবাদিকেরা আগমন করলেন। ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

ঐ অপূর্ব সময়ে, একখানি যান ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়ের অবস্থান ভবনের সম্মুখে করল যেন অভিযান। একজন জাপানী সেই যান হতে অবতীর্ণ হলেন। অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। রাসবিহারী

ও হেরম্বলালকে তাঁর শকটে গ্রহণ করলেন। যান যেন ঝটিকা বেগে প্রস্থান করল। সেই শকট হ'ল যেন সংকটহারী।

উহার পরবর্তী অষ্টবর্ষকাল রাসবিহারী কোন্ স্থানে অবস্থান করলেন, তা জানলেন শুধু একজন জাপানী জননী এবং তাঁর একটি নন্দিনী।

সেই ঘটাময় ঘটনার প্রধান নায়িকা কে ?

তাঁর নাম শ্রীযুক্তা কোকো।

অসামান্য সামান্য রুটি ব্যবসায়ী

জাপানের রাজধানী টোকিওর অতি নিকটবর্তী সিঞ্জুকু স্টেশন। সেই স্থানে একটি রুটি বিক্রয় বিপনি। নাম 'নাকামুরায়া'। মালিক আইজো সোমা।

ভারতীয় বিপ্লবীদ্বয়ের নির্বাসন দণ্ডাজ্ঞায়, আইজো সোমার চিত্তে উদ্‌বেগতরঙ্গ উথলায়।

১লা ডিসেম্বর তারিখে তিনি 'নিরোক' পত্রিকার সম্পাদক নাকামুরাকে বলেন, আমার আছে একটি পুরাতন শিল্পশালা। সেইখানে ভারতীয় স্বদেশ প্রেমিকদ্বয় অবস্থান করতে পারেন।

সেই পরগৃহ তাঁরা স্বগৃহের মতো কাজে লাগাতে পারেন। আমাদের জাপানী সরকার এই সামান্য রুটী বিক্রেতাকে সন্দেহ করবেন না। আমার সেই পুরাতন শিল্পশালার প্রতি সরকারী শ্যেন-দৃষ্টি পতিত হবে না।

তখন সেই অসামান্য সামান্য রুটি ব্যবসায়ীর প্রস্তাবে, শ্রীনাকামুরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। তিনি শ্রীযুক্ত টোয়ামার নিকট ঐ বার্তা জ্ঞাপন করলেন। টোয়ামা যেন স্বর্গের সন্দেশ পেলেন।

টোয়ামার ভবন তখন পুলিশ ও গোয়েন্দায় অবরুদ্ধ প্রায়। সেই

অবস্থায়, বিদেশী রাসবিহারী ও হেরম্বলাল প্রবিষ্ট হলেন টোয়ামা ভবনে। তার পরে, সেই দিবসের আলোকের হ'ল অবসান।

সন্ধ্যা-সমাগমে রাসবিহারী ও হেরম্ব সে স্থান হতে করলেন প্রস্থান। স্থান লাভ করলেন নাকামুরার পুরাতন শিল্পশালায়।

জাপানী সরকার জানলেন, টোয়ামা মহোদয় করেছেন সেই নাটক বিরচণ। টোয়ামার নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করলেনঃ বিদেশী রাসবিহারী বসু এবং হেরম্বলাল গুপ্ত ইচ্ছাপূর্বক জাপান পরিত্যাগ করুন।

টোয়ামা মন্তব্য করলেন, এ প্রস্তাব অতি অকরুণ!—অতি নিদারুণ!

ভারতীয় স্বদেশপ্রেমীদ্বয়ের জীবনে যখন সেই ঘোর অমা, তমন তাঁদের সম্মুখে চারু চন্দ্রিকা হলেন জ্ঞানী জাপানী টোয়ামা।

ভারতবিদ্বেষী স্বার্থান্বেষী বৃটিশের প্ররোচনায় ও প্রভাবে তখনকার জাপান সরকার টিপে ধরতে চাইলেন ভারতসেবক বিপ্লবী বীরের টুঁটি। তখন যে বিদেশী তাঁকে ভ্রাতৃবৎ রক্ষা করলেন, তিনি বিক্রয় করতেন রুটি।

উদারতার দ্বার

রুটি বিক্রেতার উদারতার দ্বার সেই বার রাসবিহারীকে যমদ্বার হতে করল উদ্ধার। সেই কাঞ্চনতুল্য কাহিনীর রূপ এইরূপঃ

সেই দিন কোন্ দিন? খৃষ্টীয় ১৯১৫ সালের ২৮শে নভেম্বর। শ্রীমতী সোমার স্বামী রুটি বিক্রেতা ব্যক্তিটি, আইজো সোমা, সংবাদপত্রে পাঠ করলেন, জাপানস্থ ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে জাপান হতে নির্বাসিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেইদিন প্রাতঃকালে, রুটি বিক্রেতা আইজো সোমা নিরোক পত্রিকার সম্পাদক নাকামুরার নিকট ঐ সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। রাসবিহারীকে রক্ষা করা তাঁর দ্বারা হয়তো সম্ভব, একথাও বললেন।

ওর পরে, আইজো সোমা অন্য কার্যের জন্য তাঁর দোকান হতে অন্যত্র গমন করলেন। নানাস্থানে কর্মব্যস্ততার জন্য, যথাসময়ে স্বগৃহে এসে তিনি আহার গ্রহণ করতে পারলেন না। একটি পান্থশালায় আহার্য গ্রহণে উপবিষ্ট হলেন। অর্ধাহার সমাপ্ত প্রায়। ঐ সময়ে তাঁর মনে পড়ল পত্রিকা সম্পাদক মহোদয়ের নিকট তাঁর স্বকীয় প্রস্তাবের কথা। তাঁর আহার করা হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পত্নীর নিকট টেলিফোন করলেন।

পরবর্তী দিবসে, সংবাদপত্রে সমগ্র জাপান অবগত হল, সমগ্র পৃথিবী অবগত হল, ভারতীয় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও হেরম্বলাল গুপ্ত নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

মহাভাবময় টোয়ামার ভবনে সমাগত হলেন ভারতীয় বীরদ্বয়। তারপর, রাসবিহারী কিমানো পোষাক পরিধান করলেন। জাপানী টোগা পোষাককে বলে 'কিমানো'। সেই কিমানো কার? টোয়ামার। হেরম্বলাল পরিধান করলেন শ্রীটুকুডা-এর সুবৃহৎ কোট। কে সেই টুকুডা? জাতীয় অন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা তিনি।

রাসবিহারী এবং হেরম্বলাল ঐ ছদ্মবেশে অধ্যাপক টেরাশু-এর ভবনের সন্নিকটবর্তী উদ্যান অতিক্রম করলেন। সেখানে এক শকট তখন অপেক্ষা করছে। বীরদ্বয় সেই শকটে আরোহণ করলেন।

সেই মোটর গাড়ীখানি ছিল তৎকালে জাপানের মধ্যে সর্বাধিক দ্রুত গমনশীল মোটর। সেই মোটরের স্বত্বাধিকারী ছিলেন সুবিখ্যাত সুবিজ্ঞ জাপানী চিকিৎসক সুজিয়ামা।

আইজো সোমা মহোদয়ের সেই সমুদার কর্মে তাঁর আপনস্থ ভৃত্যরাও তাঁর আপন জনের মতো মহদাচরণ করেছিলেন।

আইজো সোমা মহোদয়ের বিপণীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন বহু কর্মী। তাঁরা সকলেই ভারতীয় বিপ্লবী বীরকে উদারভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা অনায়াসেই জাপান সরকারের নিকট সেই নাটকীয় ঘটনা প্রকাশিত করতে পারলেন। রাসবিহারীর সর্বনাশ

করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন ব'লে বিদেশী স্বদেশপ্রেমিককেও আপনজন ব'লে গণ্য করেছিলেন।

জাপান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি প্রদত্ত নির্বাসনাদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন চারিমাস অপেক্ষাও অধিক কাল পরে। তখন রাসবিহারী যেন রাহুমুক্ত হলেন।

রাসবিহারীকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে, জাপানের নানা ক্ষেত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সহায়তা দান করেছিলেন,—এবং পুলিশের নানারকম উৎপাতে পতিত হয়েছিলেন।—নিঃস্বার্থভাবে করতে গিয়ে বিদেশীর হিত, তাঁরা হলেন উৎপাতে পতিত। তবু, তাঁরা তাঁদের সেই অবস্থাকে তিক্ত ব'লে মনে করেন নি, মনে করেছেন অমৃতসিক্ত ব'লে। আইজো সোমা-এর পত্নী রাসবিহারীকে আত্মজবৎ যত্ন করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৯১৬ সালে, এপ্রিল মাসের এক দিবসে, জাপানের আকাশে প্রতিভাত হল এক প্রভাত।

রাসবিহারীও তখন তাঁর গুপ্ত আশ্রয়স্থান হতে সকলের সম্মুখে হলেন প্রতিভাত।

রাসবিহারী সেইদিন আইজো সোমা মহোদয়ের ভবন ত্যাগ করলেন. সেদিন রাসবিহারী শ্রীযুক্তা সোমাকে মাতৃবৎ বন্দনা করলেন। শ্রীযুক্তা সোমা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

স্বদেশ-প্রেমের ক্ষেত্রে, জাপানী জাতির প্রত্যেকেই যেন মহাজন। তাই স্বদেশ-প্রেমিক ভারতীয় জন যেন হ'য়েছিলেন তাঁদেরই পরম আপন জন।

জাপানের নানা শ্রেণীর মানুষ যে সেই ব্যাপারে মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন, তা স্মরণীয় বটে। নির্বাসন দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত হওয়ার পূর্ববর্তী ঘটনা এইরূপ, হেরম্বলাল গুপ্ত গুপ্ত-জীবন যাপনকে একটা যম-যন্ত্রণাবৎ গণ্য করলেন। এক দিবসে, ঘোর নিশায়, হেরম্বলাল, রাসবিহারীকে সোমার গুপ্ত আবাসে একা ফেলে, জানলার পথে নেমে পড়লেন। কিছুদূর অগ্রসর হলেন। তারপর দরিদ্র একজন খ্রীষ্টীয় ধর্মাযাজকের

আবাসে আশ্রয় প্রার্থী হলেন। সেখানে আশ্রয় পেলেন। তখন অখিল এশীয়-সমিতির সভাপতি ছিলেন ওহকাওয়া। দরিদ্র সেই ধর্মযাজক শ্রীওহকাওয়াকে জানালেন ভারতীয় বিপ্লবী বীর হেরম্ব-লালের আশ্রয় প্রাপ্তি প্রয়োজনের কথা। ওহকাওয়া সে ব্যাপারে টোয়ামা-এর মতো এবং আইজো সোমার মতো মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন। পরের উপকারার্থে বিপদকে তারা সম্পদ ব'লে গণ্য করেছিলেন।

বিপ্লবী বীর হেরম্বলাল গুপ্ত পরবর্তী কালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন গুপ্ত ভাবে। কিন্তু তথাপি, তার স্বদেশ প্রেম কোনদিনই সুপ্ত ছিল না।

তখনকার ভারতের ইংরাজরাজ গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা জাপানস্থ রাসবিহারীকে চিরসুপ্ত—চিরতরে অবলুপ্ত করার চেষ্টাও করেছিল। ঐরূপ চেষ্টা চলেছিল কয়েক বর্ষকাল।

ঐ জন্যই রাসবিহারী সেই কয়েক বর্ষে বহুবার তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

ভারতহিতৈষী জাপানী জনেরা তখন রাসবিহারীর বন্ধুর কাজ করেছিলেন—ইংরাজেরা ষড়যন্ত্রটা বিকল ক'রে দিয়েছিলেন।

আরও বিস্ময়ের কথা হচ্ছে যে শ্রীযুক্ত সোমা মহোদয় নিজেই, ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে, বেশ কিছু কাল ধ'রে রাসবিহারীর দেহরক্ষী ও পার্শ্বচরের কার্য করেছিলেন।

সঙ্গিন অবস্থায় জীবন-সঙ্গিনী প্রাপ্তি

তখনকার ভারতের বিদেশী শাসকের চরও চক্রান্ত করতে চাইছে তখন রাসবিহারীর জীবনান্ত। শ্রীআইজো সোমার মনে হল, রাসবিহারীর জীবন রক্ষা করার জন্য তাঁর পার্শ্বচর চাই, রক্ষী চাই। আর সেই লোক খুব বিশ্বস্তও হওয়া চাই। মহৎ পুরুষ টোয়ামার মনেও তখন ঐ মহৎ চিন্তা। শ্রীটোয়ামা হঠাৎ একদিন শ্রীসোমার

নিকট বললেন ভারতীয় বীর রাসবিহারীর অবস্থা তো এখন সঙ্গিন। তাঁর এই সঙ্গিন অবস্থায় শ্রীমতী সোমা এবং শ্রীসোমা তাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা তোষিকোকে রাসবিহারীর জীবনসঙ্গিনী করে দিতে পারেন কি?

শ্রীসোমা ধনী রুটি ব্যবসায়ী। তাঁর কন্যা তোষিকো সুশিক্ষিতা এবং সুন্দরী। তোষিকোকে পত্নীরূপে পাওয়ার জন্য, জাপানের বহু ধনীর সুশিক্ষিত পুত্ররত্ন তখন আগ্রহশীল।

আর, ভিন্ন জাতীয়ের সঙ্গে পরিণয়! আন্তর্জাতিক পরিণয় জাপানী সমাজের মোটেই অনুমোদিত নয়।

আরো বিবেচ্য বিষয় রয়েছে: সামুরাই সম্প্রদায় জাপানে অতি সম্ভ্রান্ত। শ্রীসোমা সেই সম্প্রাদায়েরই লোক।

সামুরাই সম্প্রাদায়ের ইতিহাস কিরূপ? কতিপয় সুবিজ্ঞ ঐতিহাসিক বলেন,—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব স্বগণ-সমভি-ব্যাহারে ঐ দেশে গমন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।—শাম্ব হতেই সামুরাই শব্দটির উদ্ভব।—সুতরাং ভারতের রক্তের সঙ্গে জাপানের রক্তের জ্ঞাতিত্ব অতি সুপ্রাচীন। অতীত কালের ভারতের ব্রাহ্মণ,—আর জাপানের সামুরাই সমাজে একপ্রকার ভূমিকা ও স্থান গ্রহণ করেন।

প্রকৃষ্ট পুরুষ শ্রীটোয়ামার প্রকৃষ্ট প্রস্তাবে শ্রীযুক্তা সোমা ও শ্রীযুক্ত সোমা বিহ্বল হলেন। তাঁরা তাঁদের কন্যা তোষিকোকে বললেন, পরদেশীয় রাসবিহারী সহায় সম্বলহীন, ধনহীন, নিয়ত গুপ্ত শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কার অধীন। কিন্তু সে বীর, সে ত্যাগী; সে মহৎ, সে অঘটন ঘটনক্ষম। কন্যা, তোমার প্রীতি কি তাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারে?

তোষিকো ভেবে দেখবার জন্য সময় চাইলেন।

মাসখানেক সময় অতিবাহিত হল। তোষিকোর পিতামাতা আবার সেই কঠিন প্রশ্ন করলেন তাঁদের তোষিকোর নিকট। তাঁরা

তখন তোষিকোর উত্তর শ্রবণ করলেন : রাসবিহারী বসুকে আমার বররূপে প্রাপ্ত হলে, সেটি হবে আমার পক্ষে একটি বর !

তোষিকোর সেই উত্তর অকষ্ট ও সুস্পষ্ট। অকূল সমুদ্রে ভাসমান দিশাহারা মানুষকে ধ্রুবতারা দেখিয়ে দেয় উত্তর। তোষিকোর সেই উত্তরও হল তাঁর জনক-জননীর পক্ষে তদ্রূপ।

তোষিকো ও রাসবিহারীর সেই পরিণয় প্রকাশ্যে হতে পারে নি। হয়েছিল শ্রীটোয়ামা. শ্রীসোমা, এবং সোমার যুবপুত্র টিকাকো প্রভৃতি অল্প কয়েক জনের সম্মুখে। তোষিকোর মাতাও রোগশয্যায় ছিলেন ব'লে বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

বিবাহের পরেও, সস্ত্রীক রাসবিহারীকে গোপনে অবস্থান করতে হয়েছিল অষ্টবর্ষ - সে কি কষ্টবর্ষ! ওর পরে, একদিন জাপান সরকারের ঘোষণা বিঘোষিত হল : ভারতের রাসবিহারী বসু জাপানের নাগরিক। সে হচ্ছে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই। রাসবিহারীর জন্য শ্রীটোয়ামার মাতৃবৎ মমতা চেষ্টার ফলেই রাসবিহারী নাগরিক হতে পেরেছিলেন।

রাসবিহারী ও তোষিকোর সেই দাম্পত্য জীবনের হর্ষ লাভ হয়েছিল মাত্র অল্প কয়েক বর্ষ। রাসবিহারীর গৃহলক্ষ্মী তোষিকো ২৮ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চ'লে গেলেন। রাসবিহারীর ক্রোড়ে রেখে গেলেন একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। পুত্রটির নাম মাসাহিদে। কন্যাটির নাম তেতুকো।

তার পরে, কয়েক বৎসর অতিবাহিত হল তখন রাসবিহারীর শ্বশুর ও শ্বশ্রূমাতা রাসবিহারীকে আবার দার পরিগ্রহ করতে বললেন। তার উত্তরে, রাসবিহারী শুধু বললেন, তোষিকোর মরদেহ বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমার প্রতি তার প্রীতি হয়ে আছে আমার জীবনের চিরন্তর দীধিতি !

অতুলা তোষিকো

রাসবিহারীর সহধর্মিণী—যথার্থ সহধর্মিণী—তোষিকো।

জাপানে সামুরাই সম্প্রাদায় অতিশয় সম্ভ্রান্ত। তোষিকো সামুরাই-কন্যা।

শ্রীআইজো সোমা জাপানের ধনী রুটি ব্যবসায়ী। তোষিকো তাঁর কন্যা।

তোষিকো গুণবতী। তোষিকো রূপবতী। তোষিকো বিদ্যাবতী।

জাপানের বহু যোগ্য যুবক তখন তোষিকোকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য প্রয়াসী।

রাসবিহারীর অবস্থা তখন কিরূপ?

রাসবিহারী তখন আশ্রয়প্রার্থী, বন্ধুবান্ধব-হীন, অর্থহীন, জাপানীদের নিকট অজ্ঞাত-কুলশীল; বৃটিশের বিদ্বেষবশে যে কোন সময়ে এসে যেতে পারে তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃসময়।

রাসবিহারীর ঐ অবস্থায়, তোষিকো স্বেচ্ছায় রাসবিহারীকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের পূর্বে তিনি বলেছিলেন, রাসবিহারী বসুকে বর্মবৎ রক্ষা করাই হবে আমার জীবনের কর্ম ও ধর্ম। তোষিকো ছিলেন স্বল্পভাষিণী। তোষিকো ছিলেন সুগৃহিণী। রাসবিহারীর সেই অবস্থায়—সেই সর্বহারা অসহায়—তোষিকো হয়েছিলেন তাঁর পান্থপাদপ।

রাসবিহারী ও তোষিকোর উদ্বাহের অল্প কিছুদিন পরের পরম এক উপাখ্যান:

রাসবিহারী তোষিকোকে বলেন: তুমি তো প্রীতিবশেই আমার পত্নী হয়েছ। আমার প্রতি তোমার প্রীতির প্রমাণ যদি এইক্ষণে চাই? ঐ উত্তাল সাগরে ঝম্প প্রদান কর ঐ বাতায়ন-পথে,—এই বাক্যে যদি তোমাকে আদেশ করি? পারবে কি, নারী?

তখন রাসবিহারীর সুগম্ভীর আননের উপর পতিত হল তোষিকোর দৃষ্টি।—সে যেন এক অপূর্ব সৃষ্টি। তোষিকোর নেত্রে নির্গত হ'ল কিঞ্চিৎ অশ্রু।

পরক্ষণেই রাসবিহারী বিহ্বল হয়ে দর্শন করলেন, তোষিকো বাতায়ন অভিমুখে ধাবমান।

তোষিকো রাসবিহারীর বাহুর বাধায় সমুদ্রে ঝম্প প্রদানে বাধা প্রাপ্ত হলেন। তোষিকো বঙ্গভাষা শিক্ষা করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তোষিকোর মাতা, রাসবিহারীর শ্বশ্রূমাতা কোকো সোমা হয়েছিলেন যেন রাসবিহারীর মাতা।

সেই সুচরিতা জাপানী ভাষায় রাসবিহারীর জীবনচরিত করেছেন বিরচিত। তিনি করেছেন ভারতের হিত। সেই হিত অমিত।

রাসবিহারী, তাঁর শ্বশ্রূমাতার সাহায্য লাভ করে, গঠন করেন "ভারতীয় জাতীয় বাহিনী" এবং "ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ"।

"এশিয়ার অভ্যুদয়" নামক গ্রন্থখানি শ্রীযুক্তা সোমার লেখনী হতেই সৃষ্টি হয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা

ভারতপুত্র রাসবিহারী তখন ভারত হতে বহু বহু দূরে। কিন্তু তখনও তাঁর জীবন বীণা বাজছে ভারতের সেবার সুরে, ভারত প্রতিষ্ঠিত তাঁর হৃদয়পুরে।

"ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ" রাসবিহারী প্রতিষ্ঠিত করলেন ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। ইওরোপের দ্বারা প্রপীড়িত এশিয়ার নানা দেষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের স্বাধীনতা-দীধিতি প্রকাশই হ'ল ঐ সমিতির কর্ম। বীর বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ঐ সময়ে জাপানস্থ হয়ে ঐ কার্য বিপুলরূপে সহায়তা করেন।

রাসবিহারী চীনের পিকিংস্থ এশীয় সম্মেলন সংঘের এবং ডঃ ওহকাওরা-এর সাহায্যে নাগাসাকিতে এক সভার ব্যবস্থা করলেন। সে হচ্ছে ১৯২৬ খ্রীস্টব্দের আগষ্ট মাসের ১লা তারিখ।

ভারতীয়, জাপানী, ফিলিপাইনী, আফগানিস্তানী, ভিয়েতনামী এবং চীনা উৎসাহীরা ঐ সভায় যোগদান করেন।

রাসবিহারী তাঁর ভাষণে বলেন, এই সভার উদ্দেশ্য এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের কটি-বল দৃঢ় করণ, প্রাচ্য ভূভাগের ভাতি বিস্তার; এশিয়ার দুর্গতি-রাতির অবসান সংঘটন।

কিছুকাল পরে, রাসবিহারীর নেতৃত্বে জাপানে প্রতিষ্ঠিত হল "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি"। জাপানস্থ ভারতীয়রা হলেন তার সদস্য।

প্রবাসী সেই ভারতপুত্র, ভারতরত্ন রাসবিহারী বর্ষে বর্ষে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতেন।—ভারত চিন্তায় তিনি জীবন যাপন করতেন।

জাপানে তিনি "ভারত জাপান সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাজ্ঞতার সত্র এক পত্র

ভারতের বহু নেতা একদা ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন বিশষ ভাবে অনুভব করেননি, তাঁরা ভারতের জন্য 'হোমরুল' প্রাপ্ত হতে পারলেই সন্তুষ্ট থাকার অভিমত প্রকাশিত করেন।

ঐ সময়ে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকাখানি ছিল খুবই প্রভাবশালী। ঐ পত্রিকার অভিমত ভারতের নানা বিষয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বাণী প্রচার করত।

বীর রাসবিহারী খ্রীষ্টীয় ১৯২২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র্ সম্পাদককে জাপানের টোকিও নগর হতে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্র যেন প্রাজ্ঞতার সত্র। ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত না হলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে না; ভারতের জন্য চাওয়া

শুধু 'হোমরুল'– সে শুধু একটা ভুল, রাসবিহারীর সেই পত্র তাহাই যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করেছিল।

রাসবিহারীর সেই পরম পত্রের সারমর্ম এইরূপ—"স্বাধীন জাতিদের মনোভাব" শীর্ষক একটি নিবন্ধ অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের একখানি পত্রিকা থেকে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত করা হয়েছে। সেই নিবন্ধ প্রণেতা অভিমত প্রকাশিত করেছেন, যে বিদেশীদের সৈন্যদলের দ্বারা ভারতে বিদেশী শাসন ভারতের যে ব্যক্তি মেনে নিতে চায়, সে ব্যক্তিকে অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিকেরা শ্রদ্ধার অযোগ্য ব'লে মনে করা ব্যতীত আর কি করতে পারে?

রাসবিহারী তাঁর সেই পত্রে বলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা কেবল মাত্র মানুষের পক্ষেই প্রয়োজনীয় নয়; সর্বপ্রকার প্রাণী এবং পাদপের পূর্ণ পরিপুষ্টির জন্যও স্বাধীনতা প্রয়োজন। এক মানুষের উপর আর এক মানুষের প্রভুত্ব ঐ প্রথমোক্ত মানবের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে, ইষ্টকে পিষ্ট করে।

ইংরাজ যদি হয়ে থাকে ভারতের মহারাজ, তা'হলে, ভারত মরত মাঝে হয়ে থাকবে মৃতপ্রায়। প্রভুত্ব পরায়ণ বিদেশীর সঙ্গে সর্ববিধ বর্জন,– এই হতে হবে ভারতের পণ।

পরাধীনতা যদি কণা মাত্রও হয়, তবু সেই কণাই দেশকে কাণা করে ফেলে, এই কথা ক'রে স্মরণ, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতকে করতে হবে পণ ও রণ!

বীর রাসবিহারী যখন ঐ পবিত্র পত্র রচনা করেন, তখনও বৃটিশের গুপ্তঘাতক হওয়ার চেষ্টা করছিল তাঁর প্রাণবিঘাতক। কিন্তু বীর রাসবিহারী—ভারতে শৌর্যসঞ্চারী রাসবিহারী তখনও মাতৃভূমির সেবাসাধনায় যথাসাধ্য তন্ময়।

ঐ পত্রে রাসবিহারীর যে বিনয় প্রকাশ পেয়েছিল, ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদকের প্রতি যে সম্ভ্রম প্রকাশ পেয়েছিল, তাহাও অন্যত্র অল্পই পরিদৃষ্ট হয়।

গুণবান জনেরা নম্রই হয়ে থাকেন। ফলবান বৃক্ষ অবনত হয়।

কলম-কৌলিন্য

রাসবিহারী কেবল মাত্র ধৃততরবারি নন, কলম-কৌলিন্যেও তিনি শোভমান।

রাসবিহারী এশিয়ার পূর্ব অংশে তথা সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের ভাতি বিচ্ছুরিত করার জন্য সদাই সাধনা-পরায়ণ ছিলেন।

ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ইত্যাদি রাসবিহারীর লেখনী মুখে প্রচারিত হয়। ভারতের প্রবাদ-প্রবচন, অভিরাম স্বাধীনতা সংগ্রাম, ভারতের রসোক্তি রাসবিহারীর লেখনী মুখে লাভ করেছে অভিব্যক্তি।

রাসবিহারীর লেখনী খাসা জাপানী ভাষায় বিচরণ করেছে মানুষের মনের জন্য নানা মণি—

১। ভগবৎ গীতা— প্রণয়ন কাল—১৯৪০ সাল
২। রামায়ণ " "—১৯৪২ "
৩। ভারতের লোককাহিনী— " "—১৯৩৫ "
৪। ভারতের হাস্য পরিহাস— " "—১৯৩০ "
৫। ভারতের দাবি— " "—১৯৩৮ "
৬। ভারত সম্পর্কে বক্তব্য " "—১৯৪২ "
৭। ভারতীয়দের ভারত— " "—১৯৪৩ "
৮। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রভাত— "—১৯৪২ "
৯। বিপ্লবী ভারত— " "—১৯৩৫ "
১০। নির্যাতিত ভারত— " "—১৯৩৩ "
১১। ভারতের মর্মস্পর্শী ইতিবৃত্ত— "—১৯৪২ "
১২। স্বাধীনতার সংগ্রাম— " "—১৯৪২ "
১৩। এশিয়ার বিপ্লব বিবরণ— " "—১৯২৯ "

১৪। নূতন এশিয়ার অভ্যুদয়—প্রণয়ন কাল—১৯৩৭ সাল
১৪। বন্ধুর নিবেদন— " " —১৯৪৩ সাল
১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের অনুবাদ— " —১৯৪৩ "

রাসবিহারী যখন ভারত ভুমিতে ছিলেন, তৎকালেও তাঁর লেখনী-খনি-উদ্ভুত মণি সংবাদপত্রের সমৃদ্ধি সাধন করেছিল।

রাসবিহারীর ভাব ও ভাবনা-রাজ্যে ভারত ছিল স্বর্ণাসনে সমাসীন।

রাসবিহারীর রচনার তালিকার মধ্যে দেখা যাচ্ছে—ধর্ম, রাজনীতি, রসরচনা ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়েতেই তিনি ছিলেন লেখনী চালনায় দক্ষ। বহু বহু মহৎভাবের সঙ্গেই ছিল তাঁর সখ্য।

এশীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাল। ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪২ সাল। এশিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংরাজের আধিপত্যের অবসান সংঘটন মানসে, রাসবিহারী জাপানের রাজধানী টোকিও নগরে এশীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। ওসাকো নগরে ঐ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হয় ২৪শে জানুয়ারী তারিখে।

জাপান ঐ সময়ে ভারতীয়দের দ্বারা 'জাতীয় বাহিনী গঠনের' ইচ্ছা করে। ঐ বিষয় সম্বন্ধে রাসবিহারী তাঁর স্বকীয় "পরিকল্পনা" জাপানের সমর বিভাগের অনুরোধে তাঁদের নিকট অর্পণ করেন।

জাপানের তখনকার অধিকৃত মালয়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করণ এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের ভারতীয়দের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠা ;—রাসবিহারীর উক্ত পরিকল্পনায় ছিল এই দুইটি প্রধান প্রস্তাব।

রাসবিহারীর ঐ পরিকল্পনা সমাদর লাভ করে। ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্বন্ধে নানারূপ কার্যের দায়িত্ব তাঁকে প্রদান করা হয়।

ঐ সময়ে রাসবিহারী দৃঢ় কণ্ঠে, দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেন : আমরা জাপানের অঙ্গুলি সংকেতে পরিচালিত হব না। আমরা স্বাধীন মনোভাব বলে কর্ম সম্পাদন করব। ভারত জাপানের অনুচর হবে না।

রাসবিহারী ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সান্নো নামক পান্থনিবাসে সাংবাদিকদের নিকট বলেন : এশিয়াবাসী যাঁরা, এশিয়ার কর্তা হবেন তাঁরা। হে ভারতীয় ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দ আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, আমাদের স্বাধীনতা পতাকা উড্ডীন করি। শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মোপদেশ, ভগবান বুদ্ধের স্বার্থলেশহীন প্রীতি, ইসলামের ঈশ্বর বিশ্বাস, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ, এবং মহাত্মা গান্ধীর মহান শক্তি আদর্শ হোক আমাদের পরম পাথেয়।

বৃটিশের কুট প্রস্তাব—ঝুট প্রস্তাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে বৃটিশ সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনে রত তাদের শাসনাধীন ভারতকে শান্ত করার চেষ্টা করে। শ্রীক্রীপ্‌স্ এক প্রস্তাব নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আসেন। সে প্রস্তাব, প্রকৃতপক্ষে ছিল বাইরে অমৃতময়, ভিতরে বিষময়।

ঐ সময়ে রাসবিহারী ভারতের ভ্রাতা-ভগিনিগণ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্না, বীর সাভারকার, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের উদ্দেশ্যে জাপান থেকে বেতার ভাষণ দেন।

রাসবিহারী ক্রীপ্‌স্-এর সেই কূট প্রস্তাব ঝুট বা অসার ব'লে প্রত্যাখ্যান করার অনুরোধ জানান। ধর্মমত ও রাজনীতিকে আলাদা

ক'রে দেখার জন্য, আত্মকলহ বিস্মৃত হয়ে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালানোর জন্য তিনি আকুল আহ্বান জানান।

শ্রীঅরবিন্দ যাতে তখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, সেজন্যও রাসবিহারী বেতার-যোগে শ্রীঅরবিন্দকে অনুরোধ জানান। রাসবিহারীর সমগ্র জীবনের সাধ—ভারতের স্বাধীনতা। তাঁর আহ্বানে তখন ব্যাংকক, সাংহাই, হংকং প্রভৃতি অঞ্চল হতে সেই সকল স্থানের ভারতীয়েরা জাপানের টোকিও নগরে মিলিত হতে লাগলেন।

ব্যাংককে তখন ছিলেন প্রীতম সিং এবং অমর সিং। ভারতের এই দুই মহান সন্তান তখন পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার বীরবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। আর জাপানে তখন ভারতের স্বাধীনতার ধ্বজাবাহী ছিলেন বীরব্রতী রাসবিহারী।

এইবাব বহু প্রবাসী ভারতীয় রাসবিহারীর স্বাধীনতার বাঁশীর সুরে শূরের মতো সমবেত হতে লাগলেন রাসবিহারীর চারিধারে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের স্ফুরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে, খ্রীষ্টীয় ১৯৪২ সালে, নানাক্ষেত্রে জাপানের জয় সংঘটিত করল ইংরাজের পরাজয়। শ্বেতদ্বীপী ইংরাজের দীপ তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হতে নিভে গেল।

তখন ভারতের বহু লক্ষ বীর সৈনিক জাপানের ছত্রতলে এসে পড়লেন। কিন্তু জাপান তাঁদের সঙ্গে আচরণ করল মিত্রবৎ—শত্রুবৎ নয়।

এইবার পূর্ববর্তী একটি দৃশ্য। খ্রীষ্টীয় ১৯৪০ সালে। হংকংয়ে বৃটিশের বন্দীশালা। সেই বন্দীশালা হতে কর্তৃপক্ষের অগোচরে বুদ্ধি

বলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে সমর্থ হলেন ভারতের তিনজন বীর সৈনিক। তাঁরা বৃটিশের কতৃত্বাধীন ভারতীয় সৈনিকবৃন্দের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার বহ্নি-বাণী প্রচার করেন।

কে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা? কারা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সেবক? ঐ ভারতীয় ত্রয়,—এইরূপই উক্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সময় আরম্ভ হয়ে গেল। খ্রীষ্টীয় ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে, এলরস্টারে বৃটিশবাহিনী জাপানী বাহিনীর হস্তে পরাজয় স্বীকার করল। ঐ নগরটিতে তখন অরাজক অবস্থা। ঐ সময়ে ব্যাংকক-এর ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অধিনায়ক ছিলেন অমর সিং। তাঁর সহকারী ছিলেন প্রীতম্ সিং। জাপানী অধিনায়ক শ্রীহুজীওয়ারা প্রীতম্ সিংকে নগর রক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। কাপ্তেন মোহন সিংকে তখন করা হল ঐ কার্যের কর্তা।

তারপর, মোহন সিং তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় প্রদান ক'রে হলেন ভারতীয় সৈনিক বীরদের অধিনায়ক। আজাদ হিন্দ ফৌজ আবির্ভূত হল। ভারতের জীবনে সেই হল এক পরম অধ্যায়।

কাপ্তেন মোহন সিং ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের কর্মী হলেন। তিনি জাপানকে জানালেন, ভারতের বরেণ্য জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে জার্মানী হতে আনয়ন করা হলে, সেইটি হবে অতি উত্তম কার্য। সুভাষচন্দ্র হবেন ভারতের স্বাধীনতা সমরের উপযুক্ত নেতা।

তখন বৃটিশ বাহিনীর পরাভূত হওয়ার পর, বহুলোক বিপন্ন হয়ে পড়ল। মোহন সিং সেই সকল লোককে সংঘবদ্ধ করতে লাগলেন। সামরিক ও অসামরিক প্রায় দশ সহস্র মানুষ তখন মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে একত্রিত।

এল খ্রীষ্টীয় ১৯৪২ সালের প্রথম মাস। আজাদ হিন্দ ফৌজ অস্থায়ী ভাবে সংস্থাপিত হল কুয়ালালামপুরে। মোহন সিং হলেন সেই ফৌজের অধিনায়ক।

আজাদ হিন্দ ফৌজে তখন কর্মীদের অবস্থা কিরূপ?

সকল কর্মীর অধিকার সমান, খাদ্য প্রয়োজনানুরূপে সমান, সমান সুযোগ সুবিধা। জাতি-ভেদ নেই, নেই ধর্ম-ভেদ জনিত ব্যবস্থা।

সমর বিভাগও সংগঠিত হল। নায়ক হলেন মেজর রামস্বরূপ, এবং কাপ্তেন আল্লাদিও খান।

সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সিংহের শিং ভঙ্গ

ব্রিটিশ সিংহের খর নখর গ্রাসে অবস্থিত সিঙ্গাপুরে জাপানী বীরেরা চালালেন অভিযান।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতা তখন ব্রিটিশের উদ্যত অস্ত্রের ভয় উপেক্ষা ক'রে সম্মুখ ব্রতী হয়ে ব্রিটিশ পক্ষীয় ভারতীয় বীরদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান ঘোষণা করলেনঃ তোমাদের প্রহরণ কি ভারতের পরাধীনতা পিশাচের পিশিত-অশনের জন্য নহে? ভারতে ব্রিটিশ সিংহের শিং নাড়া কি তোমরা সহ্য করবে?

মোহন সিংহের সেই আহ্বান হল যেন সম্মোহন মন্ত্র, জাগ্রত ক'রে তুলল ভারতীয় সৈন্যদের প্রাণ। তাঁরা মহাকুতূহলে 'ভারতের জয়' বলে যোগদান করলেন ভারতীয় জাতীয় সেনাদলে।

সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সিংহের শিং ভেঙে গেল! ঐ সময়ে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র ভারতীয় বীর সৈনিক ভারতের স্বাধীনতা অর্জনমন্ত্রে মত্ত হয়ে উঠলেন।

অবস্থা তখন কিরূপ ?

মোহন সিং তখন আজাদ হিন্দ ফৌজকে শক্তিশালী করণ কর্মে তৎপর। প্রীতম সিংও ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ বা আই. আই. এল. সমিতি সংগঠনে সচেষ্ট।

ঐ সময়ে তাঁরা এক তারবার্তা প্রাপ্ত হলেন জাপানের রাজধানী হতে : প্রবাসী ভারতীয়দের স্বাধীনতা মহাসম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে টোকিওতে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং আই. আই. এল. থেকে প্রতিনিধিরা ঐ সম্মেলনে যোগদান করুন,—রাসবিহারী বসু তাঁদের প্রতি এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেছেন।

ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের মোহন সিং, শ্রীগিল ও আক্রাস খান ; এবং আই. আই. এল. এর প্রীতম্ সিং, যেনন, স্বামী সত্যানন্দ পুরী, শ্রীগুহ, শ্রীআয়ার এবং শ্রীটাগোন এক শুভেচ্ছা মিশন হিসেবে, টোকিও যাত্রা করেন। সাইগন হতে তাঁরা দুইখানি বিমানে আরোহণ ক'রে চলতে থাকেন।

যাত্রাপথে একখানি বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে, প্রীতম্ সিং, আক্রাম খান, আমার আয়ার এবং স্বামী সত্যানন্দ পুরী নিহত হন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরবে কারা হন গরীয়ান্ ?

ঐ যাঁরা নিহত হলেন, তাঁরাই।

জাপানে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো বহু সংখ্যক লোকসহ যোগদান করেন।

ভারতীয়রাই ভারতের কর্তা ; ভারতীয়রা কাহারও অধীন না হয়ে, তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাবেন,—মোটামুটি এইরূপ নীতি স্থির হ'ল।

এর পরে, একটি সভা অনুষ্ঠিত হ'ল উনো নামক উদ্যানে, একটি ভোজন-ভবনে। তখন হল খ্রীস্টীয় ১৯৪২ অব্দের মার্চ মাস। ভারতের কয়েকজন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হয়ে, প্রায় সহস্র জাপানীসহ ঐ সভায় যোগদান করেন। রাসবিহারী সেই অনুষ্ঠানে জাপানীদের অভিনন্দন লাভ করেন। তারপর, রাসবিহারীর অধিনায়কত্বে অনুষ্ঠিত হল ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘের অধিবেশন। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ হল তখন প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বাধীনতা সংস্থা এবং রাসবিহারী বসু হলেন তাঁর অধিনায়ক।

রাসবিহারী হলেন তখন ভারতের স্বরাজ-রণ-নৌনায়ক।

সিঙ্গাপুরের বিদাদরি নামক এক স্থানে অনুষ্ঠিত সমর-নায়কগণের এক মহতী অধিবেশনে স্থির হল ঃ "ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য যুদ্ধ করা হবে ; ভারতী সৈন্যদল গঠন করা হবে। ভারতের জাতীয়-কংগ্রেসের আদেশ শিরোধার্য ক'রে তাঁরা সংগ্রাম করবেন ; সেই আদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সমরের জন্য প্রস্তুত হতে থাকবেন।" ঐ সকল প্রস্তাব যাঁরা মেনে নিলেন, সেনাদলের তাঁরাই হলেন সৈনিক।

ব্যাংককে অপূর্ব অধিবেশন

ব্যাংককে বিরাট, অপূর্ব এক সম্মেলন। খ্রীস্টীয় ১৯৪২ অব্দের মে মাস। ১৫ই তারিখ। দুইশত ভারতীয় সেই অধিবেশনে আসীন। আর অতিথিরূপে আসীন জাপান, ইটালী ও জার্মানীর রাষ্ট্রদূতবৃন্দ ; আসীন শ্যাম দেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীবৃন্দ।

সভার প্রারম্ভে মহাধ্বনি ধ্বনিত হল. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের সৃষ্ট 'বন্দেমাতরম্' সংগীত।

শ্যাম দেশবাসী ভারতীয়বৃন্দের প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুক্ত দাস শ্রবণ করালেন অভিনন্দন-বাণী। শ্যামের প্রধানমন্ত্রীর বাণীও বিঘোষিত হ'ল। তারপর রাসবিহারী এক ভাষণ দিলেন অতি মনোহারী। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি সকলকে সবল পন্থা গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

মোহন সিং, রাঘবন এবং জাপানের ভারতীয় প্রতিনিধির ভাষণ; সুভাষচন্দ্র বসুর বাণী; ইটালী দেশের রোমের ভারতীয় মিত্রবৃন্দের বাণী; সেই মহাসম্মেলনকে করে তুলল যথার্থ ই মহাসম্মেলন।

ভারতীয় জনগণ এবং সৈনিকগণ যাতে বিপ্লবপন্থা অবলম্বন করেন সেই অবস্থা সৃষ্টি করা হবে ব'লে সিদ্ধান্ত করা হল। কর্মপরিষদ সেই কর্ম সম্পাদন করবে। কেন্দ্রীয় সমিতি এবং শাখাসমিতি গঠন করা হল। গোপন পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল। আরও একাধিক-সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। ব্যাংককে সংস্থাপন করা হল ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের সদর কার্যালয়। সিঙ্গাপুরে হল আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যালয়।

জাপান হতে ব্যাংককে আগমনক্ষণে রাসবিহারী তাঁর শ্বশুর শ্রীযুক্ত আইজো সোমা, শ্বশ্রূমাতা শ্রীযুক্তা কোকো সোমা, পুত্র মাসাহিদে এবং কন্যা তেতুকু প্রভৃতির নিকট হতে যেরূপে বিদায় গ্রহণ করেন, সেরূপ—বীরের রূপ, স্থিরের রূপ, ভারত-ভাতি ভূষিত ভারতপুত্রের রূপ।

রাসবিহারীর পুত্র মাসাহিদে এবং পুত্রী তেতুকু ভারতের হিতে সর্বদাই কর্ম-সম্পাদনে ইচ্ছুক ছিলেন। মাসাহিদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যোদ্ধা হয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

বিশিষ্ট সম্মেলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

ব্যাংককের সেই বিশিষ্ট সম্মেলনের বিশিষ্টবৃন্দের পরিচয় মোটামুটি এইরূপ ঃ মোহন সিং—ভারতের বৃটিশাধীন সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম অধিনায়ক। সেই মহতী অধিবেশনে কয়েক ঘণ্টাকাল যাবৎ এঁর ভাষণ মানুষকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। সিঙ্গাপুরে এর অতুলনীয় সাহস মানুষকে করেছিল বশ।

আনন্দমোহন সহায়—বিহারের অধিবাসী। তিনি ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্বাসিত হন। কোবে নামক স্থানে ইনি ভারতের স্বাধীনতা সাধনে কর্মরত হন। পরে রাসবিহারীর সহকর্মী হন।

রাঘবন—মাদ্রাজের অধিবাসী। পেনাংয়ে আইনজীবী ছিলেন।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী—অধ্যাপক ছিলেন ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

দাস—শ্যাম দেশের সহস্র সহস্র ভারতীয় জনের নেতৃত্ব করে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন অনুষ্ঠান করেন।

ওসমান—ভারতীয় বণিক।

খাঁ—হংকংয়ে অবস্থান করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা-অর্জন আন্দোলনের নেতৃকর্ম সম্পাদন করেন।

হক্—ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন ইন্দোনেশিয়ায়।

প্রীতম সিং—ব্যাংককে ভারতের স্বাধীনতা-সংঘের নায়ক।

এ. এম. নায়ার—মাঞ্চুকুর রাজধানীতে তত্রস্থ ভারতীয়গণের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্ণধার।

রতিয়া—দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। দীর্ঘকাল ছিলেন বিপ্লব কর্মের অনুষ্ঠাতা।

রাস-সুভাষ

রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু—রাসবিহারী ও সুভাষ—রাস-সুভাষ, ভারতের পরাধীনতা-তমস্‌-নিরসনে যেন চন্দ্রভাস-সূর্যভাস।

ভারত হতে বৃটিশ বর্বরতার উৎসাদনে উন্মুখ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ', নানা কারণে যখন বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন বীর বিপ্লবী রাসবিহারী স্বীয় প্রতিভাবলে সেই ফৌজকে পুনর্গঠিত করতে সমর্থ হন। তাঁর ভাষণ, তাঁর ভারত ভাব, তাঁর কর্মশক্তি 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'কে পুনর্বার পূর্ণ বিক্রমশীল ক'রে তোলে।

খ্রীষ্টীয় ১৯৪৩ অব্দের প্রথম ভাগে, বীর রাসবিহারী পুনর্বার 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'কে সুস্থির করতে সমর্থ হন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিশেলধারী সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু খ্রীষ্টীয় ১৯৪১ অব্দের প্রথম মাসে কলিকাতা হতে ছদ্মবেশে ভারতের বাইরে চ'লে যান। সঙ্গে নিয়ে যান ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আশার আলোক-বর্তিকা। তিনি আফগানিস্তানের কাবুল থেকে জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে উপনীত হন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সংগ্রামী সৈনিকদল সংগঠনে প্রয়াস ও প্রযত্নশীল হন। তারপর, সুভাষচন্দ্র ডুবো জাহাজযোগে কিয়েল হতে যাত্রা করলেন জাপান অভিমুখে। উপনীত হলেন সুমাত্রা দ্বীপে। সেখান হতে ব্যোমযানযোগে উপনীত হলেন টোকিওতে।

বীর রাসবিহারী তখন কোথায়? সিঙ্গাপুরে। তিনি তখন সিঙ্গাপুরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংগঠনে কর্মব্যস্ত।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জাপানের মন্ত্রী এবং সেনানায়কদের আলোচনা হ'ল।

জাপান তখন চাইল, সুভাষচন্দ্র ভারত হতে বৃটিশ বর্বরতার উচ্ছেদ সাধন সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

রাসবিহারীর নিকট উপস্থিত হ'ল সেই সংবাদ। রাসবিহারী তখন প্রাপ্ত হলেন পরম আহ্লাদ। তিনি উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, সুভাষ হউন ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। প্রশংসনীয় পুরুষপ্রবর সুভাষ বিচ্ছুরিত করুন তাঁর ভাস। ভারতের পরাধীনতা-অন্ধকার প্রাপ্ত হোক বিনাশ।

মানুষ তখন দর্শন করল নেতৃপদে অধিষ্ঠিত রাসবিহারী বসু নেতৃত্বে লোভহীন। রাসবিহারী টোকিও নগরে গমন করলেন। সে হচ্ছে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়। ভারতের সেই দুই জ্যোতিষ্ক মুখোমুখী হলেন, আলিঙ্গন বদ্ধ হলেন। ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন সংগ্রামের কর্মপন্থা সম্বন্ধে কতই আলোচনা হ'ল।

রাসবিহারী পুনর্বার সিঙ্গাপুরে গমন করলেন। সুভাষও গমন করলেন। সেই দিনটি হচ্ছে ১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই।

বিরাট সভা। স্বরাট সভা। 'বন্দেমাতরম্' সংগীত পবিত্র ও উদ্দীপ্ত করে তুলল সেই সমাবেশ। রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল,—ভ্রাতৃবৃন্দ, বৃন্দারকবৃন্দ-মধ্যে দেবেন্দ্র যদ্রূপ, আমাদের মধ্যে এই সুভাষচন্দ্র তদ্রূপ। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' সুভাষের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত হোক! আমি সুভাষচন্দ্র বসুর করে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে'র কর্তৃত্ব অর্পণ ক'রে আমার কর্তব্য সম্পাদন করি।

তখন আবার 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি মুহূর্মুহু 'বন্দেমাতরম্'! প্রস্তুত হলেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকগণ।

সুভাষচন্দ্র বসু হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

রাসবিহারীর সম্বন্ধে ডঃ জিলানীর অভিমত ঈদৃশঃ

রাসবিহারী বসু কেবলমাত্র এশিয়ার পূর্ব অঞ্চলস্থ ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বরাজ অর্জনের বহ্নি-বীজ বপন করেন নি। ইন্দোনেশিয়া এবং চীন প্রভৃতিতেও রাসবিহারীর জাগৃতির মন্ত্র

মানুষকে জাগ্রত করেছে। জাগ্রত মহাদেশ এশিয়া রাসবিহারীর অগ্নিগর্ভ প্রচারেরই ফলস্বরূপ।

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকারের রাসবিহারী প্রশস্তি যথার্থ। রাসবিহারী বসু এশিয়ার পূর্ব অংশে স্বাধীনতার যোদ্ধ্দল প্রস্তুত করেন। রাসবিহারীর লেখনী অশনিবৎ; রাসবিহারীর সংগঠন শক্তি, ভারতভাব, স্বাধীনতা স্পৃহা প্রভৃতির অন্যতম প্রমাণ। আমাদের ভারতের ভাস্বরত্ব সম্পাদনে—স্বাধীনতা অর্জনে—রাস-বিহারীর অবদান—মহান—সুমহান।

সুচিত্র বিচিত্র চরিত্র

ভারতপুত্র রাসবিহারীর জীবন সুচিত্র বৈচিত্র্যময়। রাসবিহারী দেশসেবক। সেক্ষেত্রে তিনি যেন পাবক—তেজস্বিতার প্রোজ্জ্বল। রাসবিহারী সংগঠক। রাসবিহারী রাজনীতি-বিশারদ। রাসবিহারী নেতা, কিন্তু নিরহংকার। রাসবিহারী ধৃততরবারি। আবার, বাদ্য-যন্ত্রধারীও বটেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক। তিনি সাহিত্য প্রণেতা। তাঁর লেখনীখনি হতে একাধিক বিষয়ের রচনা-রত্ন তিনি বিতরণ করেছেন। রাসবিহারী পিতৃভক্ত, মাতৃভক্ত, ভ্রাতৃ-অনুরক্ত। বাগ্মিতার ক্ষেত্রেও তিনি বাগ্‌দেবীর সুযোগ্য সন্তান। তাঁর বক্তৃতা-কালে, শ্রোতারা একটা প্রবল জীবন-স্রোত অনুভব করত। তাঁর ভাষণশব্দ যেন নব অব্দ সৃষ্টি করত। ভারত সম্বন্ধে তিনি কতই ভাষণ দিয়েছেন! আহার-বিহার, আচরণে, তিনি আড়ম্বরহীন। বিনয়-বিভূষিত। তিনি বহু ভাষাবিদ। সুপণ্ডিত। জাপানের উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত সম্বন্ধীয় বিষয়ের অধ্যাপকপদ অলংকৃত করেছেন। ভারতমন্ত্র ছিল তাঁর জীবনের তন্ত্র।

রাসবিহারী তাঁর সহধর্মিনী এবং পুত্র ও কন্যাকে বঙ্গভাষা শিক্ষাদানে একান্তই উৎসুক ছিলেন। বঙ্গভাষার শিক্ষাদাতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত করেছিলেন।

রাসবিহারী জাপানে হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠায় পরম উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন। ভারতের ভাতিদ্বারা এই ভবকে ভাস্কর ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন। "এশিয়া এশীয়দের", এই গুরুত্বপুর্ণ বাণী তিনি বিঘোষিত্ত করেছিলেন।

জাপানে ভারতীয় রন্ধন-প্রথায় অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে পরিবেশনের ব্যবস্থাও তিনি একদা করেছিলেন। জাপানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন "ভিলা এশিয়ান" নামক অন্নশালা। তিনি ছিলেন রন্ধন বিশেষজ্ঞ। ঐ সময়ে এ, কে, পাণ্ডে নামক এক তরুণ ছিলেন রাসবিহারীর প্রতি অনুরক্ত সহকর্মী।

ভারতের পুস্তক-পুষ্পের সৌরভ তিনি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

জাপান থেকেও তিনি তাঁর পিতার জন্য অর্থ প্রেরণ করেছেন; অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের জন্যও নানা দ্রব্য প্রেরণ করেছেন।

রাসবিহারী তাঁর বিমাতার মধ্যেও তাঁর মাতাকে বন্দনা করে-ছিলেন। বিমাতার পারলৌকিক কার্যসম্পাদনে তিনি যে নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তা দুর্লভ। রাসবিহারীর পত্নী-প্রীতিও অপ্রমেয়।

রাসবিহারীর চিত্তের চিন্ময়তার পরিচয় তাঁর নিম্নোক্তরূপ বাণী হতে প্রাপ্ত হওয়া যায়ঃ নানারূপ বিপদ-আপদ সম্পদেরই সোপান।

আত্মবলি দাও। অন্যকে অন্য মনে ক'রো না। সকলকে আপন জ্ঞান ক'রে জীবন-আপণ সুসজ্জিত কর। কোন কিছু দান ক'রে গর্ববোধ করো না। তুমি যখন পৃথিবীতে আগমন করেছ, তখন তো কিছুই নিয়ে আসনি।—সুতরাং তুমি যা দান কর, তাও তোমার অবৈধ সঞ্চিত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু নয়। নব ভাবধারা গ্রহণ কর।

বিবেক-বলে বলীয়ান হও। অনুগ্রহ চেও না ; কাউকে নিগ্রহও করো না।

"এশিয়ান রিভিউ", "জাপান ও জাপানী", "নিউ এশিয়া" প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে রাসবিহারীর যোগ ছিল সুনিবিড়।

কোরিয়া দেশের মানুষ রাসবিহারীকে কুটুম্ববৎ সমাদর করেছেন।

রাসবিহারী জাপানের সর্বশ্রেণীর লোকেরই হয়ে পড়েছিলেন আপন জন। জাপানী সরকার রাসবিহারীকে মান-মুকুটে বিভুষিত করেছেন। জাপানে রাসবিহারীর সমাধি মন্দির সকলের নিকট গণ্য হয়ে উঠেছে যেন দেব-মন্দির।

রাসবিহারীর কণ্ঠ, কলম, কৃপাণ ভারত ভূমির সেবায়, বিশ্বভূমির সেবায় সততই ছিল আগুয়ান।

অনন্তপথের পান্থ

বীর রাসবিহারী টোকিও গমন করলেন।

ভারতের সুস্থতা সম্পাদন কর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন রাসবিহারী বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শয্যা গ্রহণ করলেন। তাঁর চিত্তে তখন কিসের চিন্তা ? বেঁচে থাকাব চিন্তা নয়, চিন্তা ভারতের স্বাধীনতার। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে 'বন্দেমাতরম্'। সেই চরম,সেই পরম।

দুটি বাঙ্গালী তরুণ, তৎসঙ্গে রাসবিহারীর অত্যন্ত অনুরক্ত শ্রীদেশপাণ্ডে রাসবিহারীর পরিচর্যায় তৎপর হন।

রাসবিহারীর কন্যা তেতুকু এবং রাসবিহারীর শ্বশ্রূমাতা শ্রীযুক্তা সোমা রাসবিহারীকে রোগমুক্ত করার জন্য সদা সচেষ্টা।

রাসবিহারী পবিত্র গীতাগ্রন্থে বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়-এ কর্মযোগ অধ্যায় শ্রবণে তখন সদা আগ্রহশীল।

তার পরে, খ্রীস্টীয় ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের ২১ তারিখে, রাসবিহারী হলেন অনন্ত পথের পান্থ।

বীর রাসবিহারী বসু ত্যাগী রাসবিহারী বসু ভারত-সেবার, বিশ্বসেবার অগ্রগণ্য স্বেচ্ছাসেবক রাসবিহারী বসু মৃত্যুর মধ্যে পদক্ষেপ ক'রে চ'লে গেলেন অমৃত-পথে।

জাপানে, রাসবিহারীর মহাপ্রয়াণে শোকদিবস দেখা দিল টোকিওতে বিনির্মিত হল রাসবিহারীর সমাধি-স্তম্ভ।

কণ্ঠে কেকরী হুংকার,
করে করবাল দুর্বার,
বাসু বসু ঐ আশুসার
স্বরাজ-রণে।

ভারতের জয়-নি:স্বন,
অরি-পারাবার-মন্থন,
স্বাধীনতা-নিধি অর্জন
জীবন পণে।